বিস্মৃত অতীত

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য

পরিবেশক

সরকার বুক স্টল
তেমাথা, চন্দননগর
হুগলী

প্রথম প্রকাশ
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

প্রকাশিকা ঃ
গীতা ভট্টাচার্য্য
সুভাষপল্লী, খলিসানী
হুগলী।

মুদ্রক ঃ
মাতৃমুদ্রণ
ফটকগোড়া, চন্দননগর

প্রচ্ছদ ঃ
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য

উৎসর্গ

●

আমার বাবা ৺ড: নিরঞ্জনকুমার ভট্টাচার্য্যের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

পূর্বকথা

অতীত অতিক্রান্ত।

দেনা-পাওনার সমস্ত হিসাব নিক্তির ওজনে মিলিয়ে নিয়ে বিদায় নিয়েছে।

তবুও সেই অতীতেরই এক-একটি বিচ্ছিন্ন-বৃহৎ ঘটনার সাক্ষ্য থেকে যায় কালের পৃষ্ঠায়—তার নাম ইতিহাস।

আবার সেইসব বিচ্ছিন্ন-বৃহৎ এক-একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় কত শত ক্ষুদ্র উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মস্পর্শী কাহিনী।

কে তার হিসাব রাখে?

অতীত তো বিস্মৃত, অতিক্রান্ত। অতীত মূক।

অথচ এমন যদি হত যে অতীত সহসা কথা বলে উঠত? তাহলে তার কণ্ঠে শোনা যেত অজানিত কত কাহিনী। কত রহস্যের আবরণই না উন্মোচিত হত!

কিন্তু তা তো হবার নয়; তাই কত ক্ষুদ্র অথচ বিচিত্র সব কাহিনী মানুষের অগোচরে চিরদিনের জন্য কালের গহ্বরে হারিয়ে গেল।

কেউ তার খবর পেল না।

কত চোখের জল, কত দীর্ঘশ্বাস; হাসিকান্না ভরা সোনার কত

মুহূর্ত ইতিহাসের পাতায় দাগ কাটতে পারল না কোথাও।

আসলে ইতিহাস যতটুকু বলে, অনুক্ত থাকে তার তুলনায় অনেক বেশী। ইতিহাসের সঞ্চরণ অতীতের রাজপথ ধরে—শাখাপথের দুয়ারে যা ঘটেছে তা নিয়ে ইতিহাসের মাথাব্যথা নেই। ইতিহাস একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়—তার বাইরে কখনো না।

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক অতি রহস্যময় চরিত্র মহম্মদ-বিন-তুঘলক সম্বন্ধে ইতিহাস বলে:

গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফকরউদ্দিন মহম্মদ জুনা খাঁ মহম্মদ বিন্-তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। সেটা ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র চল্লিশদিন তিনি তুঘলকাবাদে অবস্থান করেন। তারপরই তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন এবং সিংহাসন অধিকার করেন।

এই প্রসঙ্গে মহম্মদের চরিত্র সম্পর্কেও নানা তথ্য পরিবেষণ করে যেতে ইতিহাস ভুল করেনি। মহম্মদের মতো এমন বিচিত্র চরিত্রের অপর কোন সুলতান আর কখনো দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নি—এই হল ইতিহাসের অভিমত।

একই মহম্মদের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। যে মহম্মদকে কোনসময় মনে হত দয়া দাক্ষিণ্যে অত্যন্ত মহৎ—সেই মানুষই পরমুহূর্তে রক্তদর্শনের পাশবিক লালসায় হিংস্র হয়ে উঠতেন। শাস্তিদানের নৃশংসতম নানা পদ্ধতি তখন মহম্মদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবিত হত। তখন মনে হত তিনি পৃথিবীর জঘন্যতম মানুষ।

মহম্মদের অসাধারণ জ্ঞান সভাসদদের প্রায় সর্বদাই বিমুগ্ধ ও চমৎকৃত করে রাখত। অথচ সেই মানুষই আবার কোন-কোন

সময় বালকসুলভ এমন সব লজ্জাকর কর্মপদ্ধতি নিরূপণে প্রয়াসী হতেন যে সেই সব প্রচেষ্টা সভাসদদের বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলত। বস্তুত সিংহাসনে আরোহণ করবার পর সাম্রাজ্য শাসনের অবসরে এই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানসিক লক্ষণগুলি মহম্মদের প্রায় প্রতিটি কার্য্যের মধ্যে দিয়েই অত্যন্ত স্পষ্টরেখায় প্রতিফলিত হত। তাই তার চরিত্র সম্বন্ধে ইতিহাস যে অভিমতটি প্রকাশ করেছে তা হল মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিলেন "পাগলা রাজা"। বাস্তববুদ্ধি বর্জিত এক অসাধারণ জ্ঞানী মানুষ।

তার সম্বন্ধে ইতিহাসের পরবর্তী সংযোজন হল: সিংহাসনে আরোহণ করবার পরই তিনি তার শাসনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। তার সেই সব প্রয়াসের পিছনে হয়তো তার উর্বর মস্তিষ্কই কাজ করেছিল। এমন সন্দেহ করবারও হেতু নেই যে এদের পিছনে শুভবুদ্ধির প্রেরণা ছিল না। তবুও এদের কোনটিই যুগোচিত হয় নি বলে ব্যর্থতাই হয়েছিল তার নিত্যসঙ্গী। সুনামের পরিবর্তে অখ্যাতির গঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছিল চতুর্দিকে।

অনুরূপ ব্যর্থ প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত হল গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী হিন্দুপ্রধান অঞ্চল দোয়াবের রাজস্ববৃদ্ধি। রাজকোষের দৈন্যকে ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে, শূন্য কুম্ভকে পূর্ণ করবার সদিচ্ছায় মহম্মদ দোয়াবের রাজস্ব এককালে চতুর্গুণ বৃদ্ধি করবার আদেশ জারি করেন। দোয়াব গঙ্গা-যমুনার পলল মৃত্তিকায় গঠিত অঞ্চল। পরন্তু সেচকার্যের জন্য জলের সেখানে অভাব নেই; সুতরাং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের প্রজাদের তুলনায় এখানকার প্রজাদের বেশীমাত্রায় কর দেবার ক্ষমতা আছে—এই যুক্তিই তার সিদ্ধান্তের পিছনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু হিসাবে ভুল ছিল গুরুতেই।

সেই সময় দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টির ফলে ফসল ভালো না হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা এমনিতেই অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। তাই অত্যধিক করভার চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা সীমাহীন হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কর-আদায়ের নামে রাজকর্মচারিগণের পাশবিক অত্যাচার। সর্বনাশের মার চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে থাকে। কোথাও কোথাও চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুনও জ্বলে ওঠে। বেশীভাগ স্থানেই স্থানীয় মানুষ বনাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য মহম্মদ-বিন্-তুঘলক সামগ্রিক অবস্থার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন। তৎক্ষণাৎ তিনি করবৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে; নিরুপায় দোয়াববাসী দলে দলে বলি হয়েছে অত্যাচার আর অবিচারের।

ইতিহাসে বর্ণিত এই মুখ্য কাহিনীর বাতাবরণে বর্তমান উপন্যাসের কায়া-নির্মিতি। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি ইতিহাসের মুখ্য কাহিনীর পশ্চাতে অনুক্ত থাকে অনেক শাখা কাহিনী—যাদের কথা ইতিহাস বলে না।

তাই ইতিহাস প্রধান কাহিনীটির সূত্রই রেখে গেছে শুধু—তারপর ইতিহাস মূক। তার ফলে, অজানা রয়ে গেছে আরো কত অপ্রধান কাহিনী যা ছিল বিচিত্র রোমাঞ্চে শিহরিত-স্পন্দিত; যে স্পন্দন মানবজীবনেরই সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী। তাই জানা হয় নি ইন্দ্র-রুক্মিনীর কথা; কিম্বা ভীম সর্দারের প্রভুভক্তির কাহিনী। অনুচ্চারিত রয়ে গেছে দিল্লী নগরীর কোন এক উদ্ভিন্ন যৌবনময়ী নারীর বঞ্চিত হৃদয়ের বুভুক্ষার কথা।

সুতরাং ইতিহাস পাশে থাক; সর্বকালের এবং সর্বযুগের যা কিছু বৃহৎ এবং দৃষ্টি-আকর্ষক তাই নিয়ে সৃষ্টি করে চলুক কথাবস্তু।

আমরা বরং প্রবেশ করার চেষ্টা করি এক শাখা কাহিনীর গহন-অভ্যন্তরে ; সেই এক হৃদয়ের অরণ্যে। ইন্দ্র কল্কিনী, ভীমসর্দ্দার, দোয়াবের অসংখ্য নিপীড়িত ও অসহায় রায়ত-প্রজা, দিল্লী-নগরীর সেই কামনাময়ী নারী এদের যোগসূত্রে গড়ে উঠুক আমাদের কাহিনী।

(এক)

১৩২৫।

দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন মহম্মদ-বিন্-তুঘলক, অতীত জীবনে যিনি ছিলেন জুনা-খাঁ। অনেকেরই বিশ্বাস, সিংহাসন দখল করবার উদ্দেশ্যে পিতা গিয়াসুদ্দিন তুঘলককে তিনি সুচিন্তিত কৌশলে হত্যা করিয়েছিলেন।

কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার সে এক শ্বাসরুদ্ধকর এবং অবিস্মরণীয় কুকীর্তি।

পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা ঘটে যাবার পিছনেই একটা না একটা প্রেক্ষাপট থাকে। যে বিশেষ কারণে বা কারণগুলির সমবায়ে একটা ঘটনা ঘটে যায় তার বীজ অনেক সময় দীর্ঘকাল পূর্বেও রোপিত হয়। এক্ষেত্রেও তেমনি ঘটেছিল মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

মহম্মদের পিতা গিয়াসুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন অনেক বয়সে। তখন তিনি প্রায় প্রৌঢ়; তার আগে নিরবচ্ছিন্ন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক লাভক্ষতির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন গিয়াসুদ্দিন। এই অভিজ্ঞতা শাসন পরিচালনার কাজে তাকে গভীরভাবে সাহায্য করেছিল। বীরসৈনিক ছিলেন তিনি—সুশাসকও। যতদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজ্যের সর্বত্র যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার প্রতি তার সদাসতর্ক দৃষ্টি

ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার দিকেও সজাগ প্রহরা রেখেছিলেন।

গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময় তখন। ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বাংলাদেশ অভিযানে যেতে হয় তাকে। বাংলাদেশের তখনও গৌড়বাংলা নামকরণ হয় নি, বাংলা তখন লখনৌতি। শান্তিশৃঙ্খলা তখন সেখানে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। চতুর্দ্দিকে চূড়ান্ত অরাজকতা। মসনদ নিয়ে চলছে ভায়ের সঙ্গে ভায়ের গৃহযুদ্ধ। অবশেষে সিংহাসন দখল করলেন গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ। বাহাদুরের অন্য দু'ভাই শিহাবুদ্দিন এবং নাসিরউদ্দিন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন অন্যত্র।

পূর্বভারতের অপরিমেয় ঐশ্বর্য গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মনের গভীরে একটা ঔৎসুক্য বহুদিন ধরেই জাগিয়ে তুলেছিল—লখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হবার মতো যে কোন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এতদিন। অতর্কিতে এসে গেল সুযোগ। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহকে দণ্ডিত করবার অভিপ্রায়ে বাংলার উদ্দেশ্যে অভিযানে অগ্রসর হলেন। দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করে এলেন জুনা খাঁর হাতে।

ভুল করেছিলেন কি সুলতান গিয়াসুদ্দিন?

জীবনের পথে চলতে চলতে জীবন-সংগ্রামের পাকা সৈনিকেরও ভুল হয়। এও কি ছিল তেমন কোন ভুল? খণ্ডকালের জন্য দিল্লীর শাসনভার হাতে পেয়ে জুনা খাঁর মনের অতলে লোভ কি সেদিন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল?

এর উত্তর মিলেছিল ছ'বৎসর পর; ১৩২৫-এ। অবশ্য ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেই দিনগুলোয় পরবর্তী ঘটনার কোন ইঙ্গিত, কোন পূর্বাভাসই লক্ষ্য করা যায় নি কোথাও। বরং সে বৎসর সুলতান গিয়াসুদ্দিন

বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করে অভিনব বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ফেরার পথে উপরি-পাওনা হিসেবে জয় করেছিলেন ত্রিহুটও। বহুদিন ধরে দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করে আপন স্বাধীনতার গৌরব শিখাটি সযত্নে জ্বালিয়ে রেখেছিল এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি। গিয়াসুদ্দিন এই স্পর্দ্ধা সহ্য করেন নি।

প্রশংসা এবং স্তুতি সেদিন স্তূপাকারে সুলতান গিয়াসুদ্দিনের পদমূলে জমা হয়েছিল।

তারপর দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হল আরো কটি বছর। দেশের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হল। মোঙ্গলেরা একবার দুর্বার আক্রমণে সীমান্ত প্রদেশ ছিন্নভিন্ন করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল—সেই আক্রমণকে প্রচণ্ড দৃঢ়তার এবং বুদ্ধিমত্তায় প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন গিয়াসুদ্দিন।

অবশেষে তার রাজত্বকালের একেবারে শেষদিকে আবারও বাংলা-দেশে দেখা দিল বিদ্রোহ। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সিংহাসনে বসবার ঠিক অগ্রবর্তী ঘটনা। বাংলার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করবার উদ্দেশ্যে নির্ভীক গিয়াসুদ্দিন গৌড়-অভিযান করলেন আবার। বয়সকে একবারের জন্য বাধা বলে মনে করলেন না। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, চূর্ণ করে দেবেন বিরুদ্ধ শক্তির মেরুদণ্ড।

প্রতিজ্ঞাপূরণে এবারও সফলকাম হলেন সুলতান। বিদ্রোহের আগুন দূর থেকে যতখানি লেলিহান মনে হয়েছিল—প্রকৃতরূপটি ছিল তার তুলনায় অনেক স্তিমিত। গিয়াসুদ্দিন দক্ষ সৈনিক; অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার পূর্ণ। সুতরাং অল্প আয়াসেই দমন করলেন বাংলার বিদ্রোহ। এবারও জয়মাল্য অর্পিত হল তার

কণ্ঠেই।

কিন্তু যুদ্ধ জয় করেও অদৃশ্য শত্রুতাকে জয় করতে ব্যর্থ হলেন সুলতান। ইতিহাসের সে এক কলঙ্ককাহিনী।

অনুমান করা যেতে পারে, পাঁচবৎসর পূর্বে জুনা-খাঁ'র মনের অতলে একটি লোভের বীজ প্রোথিত হয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ-বৎসরে সেই বীজ থেকে উপ্ত চারাটি পরিণতি লাভ করেছিল একটি মহীরূহে।

জুনা-খাঁর সিংহাসনে বসার পথে এখন প্রধান বাধা স্বয়ং তার পিতা গিয়াসুদ্দিন। বয়সে তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু অসাধারণ কর্মশক্তির অধিকারী। প্রজানুরঞ্জক তিনি। প্রতিটি অভিযানে তিনি সফলকাম। সুতরাং এখনই তার সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জুনা-খাঁই বা কতদিন অপেক্ষা করবে? তার মনে দারুণ তৃষ্ণা; সম্মুখে সুপেয় জলের হ্রদ, অথচ এক গণ্ডূষ পান করবার অধিকার নেই।

সুতরাং বর্তমান সুলতানকে পৃথিবীর ধূলি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে ভাবীকালের এক সুলতানের তক্তে বসবার উদগ্র কামনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য। অনুরূপ চিন্তাই সেদিন সম্ভবতঃ জুনাখাঁকে প্ররোচিত করেছিল ইতিহাসের সেই জঘন্যতম কুকার্যটি সংঘটিত করতে। গিয়াসুদ্দিন হয়তো এই কুৎসিত চক্রান্তের সামান্য আভাস পূর্বাহ্নেই জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সামান্য ধোঁয়া দেখে আগুনের প্রকৃত ভয়াবহতা অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই তাকে জীবন দিয়ে ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের মুখে সুলতান গিয়াসুদ্দিন চরের কাছে সংবাদ পেলেন যে তার জ্যেষ্ঠাপুত্র জুনা-খাঁ।

আপন শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই এক অতি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছেন ; যারা শুধুমাত্র জুনা খাঁর কর্তৃত্বই মানে। শুধুমাত্র তাই নয়, এর মধ্যে জুনা-খাঁ নাকি শেখ-নিজামুদ্দিন আউলিয়ার শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছে এবং আউলিয়ার পরামর্শেই নাকি বর্তমানে তাকে পরিচালিত করছে।

দুটি সংবাদই ভয়ানক,—সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় সংবাদটিই সুলতানের কাছে বেশী বিপজ্জনক মনে হল। আউলিয়ার সঙ্গে জুনা-খাঁর এই হৃদ্যতার অর্থ কি ? নানাকারণে আউলিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুখকর নয়। সম্প্রতি সেই সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততায় পরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং শেখ কি জুনা খাঁকে সৎ পরামর্শ দান করবে ? না, তা সে করতে পারেনা। এমনিতেই সে সাপের মতো খল ; এখন আবার প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কি মনোভাব গ্রহণ করবে তা গিয়াসুদ্দিনও কল্পনা করতে পারেন না।

সুলতানের মনের যখন এই দোলাচল অবস্থা তখন চরের মুখে আর এক নতুন সংবাদ এসে পৌঁছল তার কাছে। শেখ নিজামুদ্দিন নাকি সম্প্রতি এক ভবিষ্যৎ-বাণী করে বলেছেন যে, সুলতান আর কোনদিনই দিল্লী ফিরতে পারবেন না। এই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা ; পথেই তার মৃত্যু হবে।

হীন চক্রান্তের নানা সংবাদ এতদিন সুলতানের মনের মধ্যে নানা তিক্ত-প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করছিল। এখন এই সংবাদ তার মনের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল যেন। এতদিনের চাপা ক্রোধ লেলিহান শিখায় আত্মপ্রকাশ করল। তৎক্ষণাৎ জুনা-খাঁকে সাবধান করে এক বার্তা প্রেরণ করলেন ; নিজের হৃদয়ের অসন্তুষ্টি তার মধ্যে অপ্রকাশ রইল না। কঠোর নির্দেশ দিলেন যাতে জুনা-খাঁ আউলিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করে। আউলিয়ার

উদ্দেশ্যেও অনুরূপ পত্র প্রেরিত হল একই সঙ্গে।

পত্র প্রেরণ করেই সুলতান সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে তার যাত্রা ত্বরান্বিত করলেন। অন্যদিকে কিছুদিনের মধ্যেই জুনা-খাঁ পিতার আগমনবার্তা পেলেন। দিল্লী নগরী থেকে তিনক্রোশ দূরে আফগানপুর নামক স্থানে সুলতানকে বিজয়-অভিনন্দন জানানোর অভিপ্রায়ে নির্মিত হল এক বিশাল তোরণ।

রাজসভার শ্রেষ্ঠ চিত্রীরা সেই তোরণে চিত্র অঙ্কন করলেন। তাদের সুপটু হাতের যাদুস্পর্শে তোরণের বিশাল স্তম্ভগুলি বিচিত্র শোভায় শোভিত হল। নগরীর শ্রেষ্ঠ বাদকেরা যন্ত্রে তুললেন সুমধুর শব্দ ঝংকার। আলোক মালার সুপ্রচুর আতিশয্যে সেই তোরণ সকলের প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

নির্দিষ্ট সময়ে জুনা খাঁ পিতাকে সেই তোরণের তলদেশে বিজয়-অভিনন্দন জানিয়ে সম্বর্দ্ধিত করলেন।

রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান কালে জুনা খাঁ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ গিয়াসুদ্দিনের কর্ণগোচর হয়েছিল তাতে পুত্রের প্রতি সুলতানের মনোভাব রীতিমতো কঠিন হয়েই ছিল। স্থির করেছিলেন কঠিন শাস্তিতে দণ্ডিত করবেন তাকে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো বিদ্রোহী হবার দুঃসাহস সে অর্জ্জন করতে না পারে।

কিন্তু জুনা খাঁর অমায়িক ব্যবহারে সুলতান একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বহুগুণে ভূষিত হয়েও জুনা খাঁ চিরদিনই অত্যন্ত উদ্ধত ও জেদী। তাছাড়া অপার উচ্চকাঙ্ক্ষীও। কিন্তু বর্তমানে তার কোন ছায়াই তিনি দেখতে পেলেন না। বরং তার আশ্চর্য নম্রতা এবং ভব্যতাবোধ সুলতানকে একেবারে চমৎকৃত করে দিল। চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করে মনে মনে গিয়াসুদ্দিন অত্যন্ত খুশী হলেন। মনের গোপন তিক্ততা

অনেক খানিই কেটে গেল। এতদিন মনের গভীরে অসন্তোষ এবং ক্রোধের সে ধূমাগ্নি ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল তাও নিভে গেল মুহূর্তে। স্থিরনিশ্চয় হলেন এই ভেবে যে দিল্লীনগরী থেকে দূরে যারা তাকে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করত তারা আর যাই হোক জুনা খাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। পক্ষান্তরে পিতাপুত্রের মধ্যে একটা তুমুল মনোমালিন্য সৃষ্টি করাই ছিল তাদের মুখ্য অভিপ্রায়। মিথ্যা সংবাদ পরিবেষণের জন্য গুপ্তচরদের কঠিন শাস্তি দেবার কথাও মনে হল সুলতানের।

কুশলপ্রশ্ন আদান প্রদান এবং চূড়ান্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হল অনেকখানি সময়। অবশেষে দ্বি-প্রাহরিক ভোজের অনুষ্ঠান শুরু হল। সমস্তকিছুর বিপুল আয়োজনে সুলতান অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন।

তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন জুনা খাঁ সযত্নে তাঁর একান্ত প্রীতিকর বহুবিধ ভোজ্যবস্তুর সমাবেশ ঘটিয়েছে। অতিথিরা সবাই উচ্ছ্বসিত, পরিতৃপ্ত। তার থেকেও বড় কথা দুষ্প্রাপ্য এবং মহামূল্যবান আসব পরিবেষিত হচ্ছে যথেচ্ছ, যদিও জুনা খাঁ নিজে আসব পানের ঘোরতর বিরোধী। তাকে প্রীত করবার জন্যই যে এই বিশাল আয়োজন—এটুকু অনুধাবন করতে তিনি ভুল করলেন না।

ভোজনান্তে জুনা খাঁ পিতার সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে সুগভীর আনুগত্যের সঙ্গে নিবেদন করলেন তার একান্ত ইচ্ছার কথা। বাংলাদেশ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট হস্তী এসেছে সুলতানের সঙ্গে। তাদের দর্শন করবার অনুমতি চান তিনি।

গিয়াসুদ্দিন যেন উত্তরোত্তর বিস্মিত ও আনন্দিত হচ্ছেন। তার সম্মুখে এ কোন্ জুনা খাঁ? এতখানি বিনীত ও অনুগত সে

কোনদিনই ছিল না। ভারী সুখকর সন্তানের এই মানস-পরিবর্তনের দৃশ্য।

সুলতান অত্যন্ত প্রীতমনে তাই জুনা খাঁর অভিলাষ পূর্ণ করবার আদেশ দিলেন। সন্তানের এই একান্ত গোপন কামনার অভ্যন্তরে কৃতঘ্নতার কোন্ বীজ নিহিত আছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও সেকথা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হলেন। বরং বিপরীতটাই মনে হল তার। দীর্ঘদিন পরে জুনা খাঁ সম্ভবত তার ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝতে পেরেছে—এই কথা ভেবে পরম স্বস্তিলাভ করলেন।

সুলতানের আদেশানুযায়ী অতঃপর সেই যূথশ্রেণী চালকদের দ্বারা অঙ্কুশাহত হয়ে সেই বিশাল সুসজ্জিত তোরণের তলদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলল। নয়নাভিরাম সেই দৃশ্য।

তারপর একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন এক বা একাধিক হস্তীর গাত্র-ঘর্ষণে তোরণের বিশেষভাবে নির্মিত এক অংশ ভয়ংকর শব্দে ভেঙে পড়ল। সেই প্রলয়ংকর শব্দের অতলে দুটি সকরুণ কণ্ঠের সর্বশেষ হাহাকার কোথায় হারিয়ে গেল—কেউ তা শুনতে পেল না।

বলাবাহুল্য সে হাহাকার সুলতান গিয়াসুদ্দিন এবং তার মধ্যমপুত্র মহম্মদ খাঁর। না, জুনা খাঁ সিংহাসনের দাবীদার কোন উত্তরাধি-কারীকেই জীবিত রাখবার ঝুঁকি নিতে রাজী নয়। তাই মহম্মদ খাঁকেও পিতার সঙ্গে প্রাণ দিতে হল। বাংলাদেশ অভিযানে তিনিও পিতার সঙ্গী হয়েছিলেন।

এইভাবে যে পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে মহম্মদ বিন্-তুঘলক সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন সে পথ ছিল ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল। কিন্তু তবু তার সিংহাসনারোহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির কোন ধূম্রজাল জমা হয়ে ওঠে নি কোথাও। কোথাও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেনি।

বরং পথের ধারে দাঁড়িয়ে অসংখ্য প্রজা জয়ধ্বনি দিয়েছিল ভাবী সুলতানের উদ্দেশ্যে। হাতের মুঠি ভরে কুড়িয়ে নিয়েছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা।

বস্তুত সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল উৎসব।

বাংলাদেশ জয় করে সমুন্নত শিরে রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পথে দুর্ঘটনার শিকার হলেন ভূতপূর্ব সুলতান; চতুর মহম্মদ প্রজাদের সেইরকমই বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর চিরবিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাসটুকু ভালোভাবে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বেই নতুন আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল মানুষ। রাজধানী দিল্লীর সুপ্তিমগ্ন সত্তা যেন এক আশ্চর্য যাদুকাঠির স্পর্শে প্রাণশক্তির অশেষ প্রাচুর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল নূতন সুলতানের অভিষেককে কেন্দ্র করে। বিষাদের শূন্য পান-পেয়ালাকে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল আনন্দের সুধারসে।

অবশ্য উৎসবের সেই পূর্ণ মত্ততার দিনগুলি কিছুদিন হল অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও আনন্দের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। চতুর্দ্দিকে তার নানা সাক্ষ্য এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎসবোত্তর দিল্লী নগরীর রাজপথগুলিতে এখনও তাই কি অপূর্ব আলোকসজ্জা। বিপণীতে বিপণীতে ফল-ফুল ও বিবিধ সম্ভারের কত বিচিত্র সমারোহ! তাম্বুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানগুলিতে রসিক ক্রেতাদের ভীড়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষণিক অবকাশে রসিকা বিক্রেত্রীদের সঙ্গে ক্রেতাদের কত লঘুচপল রঙ্গব্যঙ্গের আদানপ্রদান।

স্থানে স্থানে দীপাবলী সজ্জিত রাজপথে আলো এখনও এত উজ্জ্বল যে তা যে-কোন বিদেশাগত নবীন আগন্তুককে দিগ্‌ভ্রষ্ট করে দিতে পারে। রাজপথে রাজপথে, কুঞ্জে-কুঞ্জে বিচিত্রসজ্জা নরনারীর কলগুঞ্জন। রূপসী নারীর অধর প্রান্তের মৃদু অথচ অর্থবহ হাসির

চকিত আভাসে পথচারীরা রীতিমতো বিভ্রান্ত।

ভূতপূর্ব সুলতানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তুঘলকাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে যে প্রশস্ত পথ ধরে অগ্রসর হয়ে এসে জুনা খাঁ একদিন রাজধানীতে প্রবেশ করেছিলেন সেই প্রশস্ত সড়কটি দিল্লীনগরীর সঙ্গে যেখানে তার যোগসূত্র রচনা করেছে পথের সেই সংযোগস্থলে এখনও দৃষ্টিগোচর হয় কাষ্ঠনির্মিত এক বিশাল ও বিচিত্র সৌধের উপর অসংখ্য রঙীন আলোর রোশনাই। অবশ্য যেদিন এই সৌধের তলদেশ দিয়ে সুলতান মহম্মদ-বিন্ তুঘলক রাজধানীতে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন এই সৌধ আরো বেশী উজ্জ্বল দেখিয়েছিল আলোকমালার প্রাচুর্যে।

কতদিন আগেরই বা কথা। সেই দিনটির স্মৃতি সকলের মনে এখনও যথেষ্ট উজ্জ্বল।

কিন্তু নগরীর চতুর্দিকে এই যে এত আলো, এত সজ্জা, এত কলগুঞ্জন—এসবই তার বহিরাবরণ। এরই পাশে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ পথগুলিতে জীবনের অন্তরূপ। আলো সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। যেখানে চারদিকে সম্ভোগের নগ্নতা। কথা সেখানে ইঙ্গিতে —তাই ভাষাহীন, অনুচ্চারিত। সেখানে গোপন ইশারায় পসরা নির্দিষ্ট করে ক্রেতা। ঝিকিকিনি অন্ধকারে, তনুশ্রীতে।

যে সময়ের কথা নিয়ে এই কাহিনী তখন দেশের প্রায় প্রতিটি সমৃদ্ধ অসমৃদ্ধ নগরীর এই ছিল আসল রূপ। সমাজের মর্মমূলে বাসা বেঁধেছিল ব্যাভিচারের ক্ষয়রোগ। জীর্ণ করে ফেলছিল গোটা সমাজের কাঠামো।

সমাজে তখন ছিল প্রধানত দুই শ্রেণী। শাসিত আর শাসক। দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল মেরুপ্রমাণ। যারা অভিজাত তাদের জন্য চতুর্দ্দিকে ছড়ানো ছিল সুখ-সম্ভোগের অনন্ত সুযোগ। অতিরিক্ত

সুরাসক্তি, অগণিত নারীর প্রতি কামজ মোহ—এগুলিই ছিল আভিজাত্য নির্ণয়ের মাপকাঠি। অন্যদিকে শাসিত মানুষের জন্য ছিল অবহেলা, নির্যাতন আর অকথ্য শোষণ। তাদের কাছে সুখভোগ ছিল স্বপ্নকল্পনার সামগ্রী।

কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও অভিজাত শ্রেণীর সুখ সম্ভোগের পথে এত গোপনতা ছিল না কোথাও। অর্থ ব্যয় করলেই হাতের মুঠোয় আসত ভোগ্য পণ্য। অথচ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে গোপনতার। সাম্রাজ্যের বর্তমান কর্ণধার যিনি তিনি এ রসে বঞ্চিত। মহম্মদ মদ্যপায়ী নন; জীবনের নিত্যদিনের স্থূল কামনাগুলি তাকে লালায়িত করে না। ভোগাসক্তি-বঞ্চিত মানুষ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক। কিন্তু মূল আশঙ্কার কথা সেখানেও নয়। আসলে মহম্মদের মতো বিচিত্র মানসিকতার ব্যক্তিদের চরিত্র কোন সময়েই অনুধাবন করা যায় না বলে আশঙ্কা। সহসাই কোন মুহূর্তে তার এক একটি চারিত্রিক লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। কখনো তিনি দয়ার মাহাত্ম্যে মহনীয়; পরক্ষণেই রক্তদর্শনের লালসায় ভয়ংকর কুটিল ও নৃশংস। তাই রাজধানীর যারা মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তারাও ভয় না করে পারেন না সুলতানকে। এমনকি যারা তার একান্ত মিত্র—শিশুকাল থেকে একত্রে আহার-বিহার করে এসেছেন তারাও সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তার নিকট থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন।

আর বিপদ সেখানেই। সহস্র মানুষের চোখের উপর রাজসভা অলঙ্কৃত করে বসে থাকেন যারা অথচ রাতের গভীরে নিতান্ত লালসার দ্রব্য আয়ত্তাধীন না হলে সমগ্র পৃথিবী যাদের চোখে বর্ণহীন ঠেকে—বিপদ তাদেরই।

সম্প্রতি তাদের যাবতীয় গূঢ় কথাই অতি সংগোপনে লুকিয়ে রাখতে হয় সমস্ত রটনার সম্ভাবনা থেকে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও

কিন্তু এই দায় ছিল না। জানেন সকলে, সুলতানের মনে অনুরূপ রটনার যে কোন একটি যে কোন ক্ষণে সৃষ্টি করে তুলতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আর তার ফলশ্রুতি? না, দুঃস্বপ্নেও সেকথা ভাবতে চান না কেউ।

এর ফলে যে কোন মুহূর্তে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠতে পারে সুলতানের অন্তরবহ্নি; তাতে ভষ্মীভূত হয়ে যেতে পারে একজনের যাবতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি। দাহ হয়ে যেতে পারে একটি তাজা প্রাণ। তারজন্য একবিন্দু অশ্রুও দেখা দেবে না সুলতানের মরুর মতো শুষ্ক দুই চোখে। এই কারণেই যত ভয়; সম্প্রতি যত গোপণতা। বহুদিনের চেনাজানা শেষে নাড়ীর যোগ হয়ে দাঁড়ায়। নির্দিষ্ট মন্ত্রী, আমীর ওমরাহদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট নগরনটীদের এখানে সেই নাড়ীর যোগ। এ অভ্যাস কিছুতেই ত্যাগ করার নয়। রূপসী নারীর নৃত্যচঞ্চল চরণের অভিনব নুপূর নিক্কণ. তাদের কোকিলকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত প্রতিরজনীতে কানে না শুনলে ঘুমের ঘোর লাগে না তাদের চোখে। এটাই তাদের কাছে জীবনসত্য।

সম্প্রতি সেই সত্যকে গোপনীয়তার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে হয় বলে যত অস্বস্তি। প্রতি পদে প্রকাশ পাবার ভয় আছে বলে বিপদাশঙ্কা।

আমীর, ওমরাহ, অভিজাতদের দল তাই মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শাসনে ভয়ত্রস্ত। সাথে সাথে শঙ্কিত রাজ্যের অগনিত সাধারণ মানুষ। অবশ্য তাদের আশঙ্কার কারণ অন্যত্র নিহিত।

ইতিমধ্যে গিয়াসুদ্দিনের সাময়িক অনুপস্থিতির অবকাশে কয়েক-বারই রাজ্যের সাধারণ প্রজা জুনা খাঁর অস্থির মস্তিষ্কপ্রসূত কার্য-কলাপের নানা দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে। তারা জানে,

সুলতানের দানের হাত যে কোন মুহূর্তে হত্যাকারীর হাত হয়ে উঠতে পারে। অস্থিরমতি সুলতানের যে কোন পরিকল্পনাই সাধারণ প্রজাদের উপর নির্মম আঘাতের রূপে নেমে আসতে পারে। আসলে অনেককাল ধরে নানা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে করে এদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আজ পূর্ণ। অনেককিছু তাই এরা পূর্বাহ্নে অনুমান করতে পারে। প্রজাদের মন যেন বলছে এক সর্বনাশের মার উদ্যত খড়্গের মতো তাহলে মাথার উপর ঝুলে আছে। ঝড় একটা উঠবেই। ঠিক কোন্ দিক থেকে জানে না তারা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা প্রলয়ংকর দুর্যোগের আভাস তারা অভ্রান্ত-ভাবে অনুমান করতে পারছে।

রাজ্যের অগণিত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের অতলেও তাই চকিত ত্রস্ততার লক্ষণ খুব দুর্লক্ষ্য নয়।

(দুই)

কাজ শুরু হয়, অনিবার্যভাবে তার অবসানও ঘটে। তেমনি সমস্ত উৎসবেরই একটা পরিসমাপ্তি থাকে—সেটাই স্বাভাবিক।

তাই সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সিংহাসনারোহণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজধানী দিল্লীনগরীর বুকের উপর আনন্দোৎসবের যে জোয়ার চলছিল তাতে এখন ভাটা নেমেছে।

মহম্মদ এখন নিয়মিত দরবারে থাকেন। কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মানুষ তিনি। তার উপস্থিতিতে দরবারকক্ষেও তাই অনিবার্যভাবে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। সপ্তাহে একদিন স্বয়ং সুলতান বিচারের ভার নিয়েছেন। ঐ বিশেষ দিনটিতে সাধারণ নাগরিকেরাও দরবারে প্রবেশাধিকার পায়। সুলতান বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন এবং রায় দেন।

এই ন্যায়বিচার অনেকক্ষেত্রেই উপস্থিত সভাসদগণের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। বিচার হয়ে ওঠে বিচারের প্রহসন। অনেক সময়ই লঘু অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুলতান অত্যন্ত কঠিন শাস্তির বিধান দেন। আবার মৃত্যুদণ্ডাদেশে দণ্ডিত হবার যোগ্য অপরাধী মুক্তি পায় নামমাত্র শাস্তির বিনিময়ে।

প্রতিবাদ করবার সাহস নেই কারো। নিঃস্তব্ধ সভাগৃহে সম্রাটের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কণ্ঠের মৃদুতম সাড়াও শোনা যায় না। মাঝে মাঝেই সুলতান তার অভ্রভেদী দৃষ্টি দিয়ে সভায়

উপস্থিত সকলের মুখের নৈর্ব্যক্তিক ভাব লক্ষ্য করেন। খুব সূক্ষ্ম হাসির রেখা তাঁর অধর স্পর্শ করে থাকে।

মাঝে মাঝেই ঘৃণা বোধ করেন মানুষগুলোর উপর। পৌরুষহীন কতগুলো ক্লীব তার চতুর্দিকে নিয়ত চাটুকারিতা করে চলেছে। এদের নিয়েই তাঁর দরবারের শোভা; এদের নিয়েই তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সফল করবার প্রস্তুতি নিতে হবে।

একটা উদ্গত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকের অতলে লুকিয়ে ফেলেন মহম্মদ-বিন্-তুঘলক।

সভাগৃহের মধ্য-মনি হিসাবে রত্নরাজিখচিত সিংহাসনে বসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে অনেক সময় স্বপ্নজাল রচনা করতে ভালোবাসেন মহম্মদ। তার দক্ষিণে দণ্ডায়মান থাকেন উজীর—পদ-মর্যাদায় যিনি মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান। উজীরের ঠিক পাশে থাকেন অপর তিনজন নির্দিষ্ট মন্ত্রী—যথাক্রমে আরিজ-ই-মামালিক, দিওয়ান-ই-ইনশা এবং দিওয়ান-ই-রাসালাত। যতক্ষণ দরবার চলে ততক্ষণই দরবারে উপস্থিত সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কারণ সুলতানের সামনে আসন গ্রহণের রীতি নেই।

সুলতানী শাসনব্যবস্থায় সমগ্র রাজ্যে সুলতানের পরই সর্ব্বোচ্চ পদ-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন উজীর। অসীম ক্ষমতা ছিল তার। সুলতানকে সর্ববিষয়ে ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ে তিনিই পরামর্শ দান করতেন। রাজস্ব এবং অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের যাবতীয় গুরুদায়িত্ব ছিল তার উপরই ন্যস্ত। উপরন্তু অন্যান্য মন্ত্রীদেরও তিনিই পরিচালনা করতেন অদৃশ্য নিয়ামকের মতো।

কোন মন্ত্রীর কর্মদক্ষতায় উজীর যদি যথেষ্ট সন্তোষবোধ না করতেন তবে তার সম্বন্ধে সুলতানকে অনাস্থা জানাবার ক্ষমতাও উজীরের ছিল। প্রয়োজনবোধে সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ

করবার বিশেষ ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল উজীরের উপর। এই সব বিশেষ কারণে মন্ত্রীমণ্ডলীর সকলেই উজীরকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। উজীরকে তার গুরুদায়িত্ব পালনে সাহায্য করতেন বহু রাজকর্মচারী—যাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল নায়েব, খুসরু-ই মামালিক ও মুসতাফি-ই-মামালিকের।

আরিজ-ই মাম্যালিক ছিলেন প্রকৃত সৈন্যাধ্যক্ষ। তার কর্তব্য ছিল সৈন্যনির্বাচন, তাদের দক্ষতা-বিচার এবং মাসিক মাহিনা প্রদান করা। অবশ্যই বহু রাজকর্মচারী তার অধীনে কাজ করতেন যাতে সুষ্টভাবে তিনি তার কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হন। মন্ত্রী দিওয়ান-ই-ইনশার কাজ ছিল জরুরী নির্দেশনামা এবং প্রচারপত্রগুলি যাতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র যথাসময়ে বিতরিত হয় তার দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা। এছাড়াও গুপ্তচর নির্বাচন এবং তাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের খবর সংগ্রহ করাও তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে বিবেচিত হত।

বিশিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থজন ছিলেন দিওয়ান-ই-রাসালাত। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত পট-পরিবর্তন সম্বন্ধে তাকে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হত। শুধুমাত্র তাই নয়, বিদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও তার মাধ্যমেই রক্ষিত হত। দিওয়ান-ই-রাসালাতই দক্ষতা ও উপযুক্ততা বিচারের পর বিদেশীয় রাজসভায় দূত প্রেরণ করবার লোক স্থির করতেন।

দরবারকক্ষে সুলতানের সান্নিধ্যে এই সব বিশিষ্ট মন্ত্রীরা তো থাকেনই। এরা ছাড়া আরো যারা উপস্থিত থাকেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বারিদ-ই-মামালিক অর্থাৎ প্রধান সংবাদ-প্রচারক, কাজী মামালিক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি, ভকিল-ই-ডর অর্থাৎ সুলতানী অন্তঃপুরের নিয়মশৃঙ্খলার রক্ষক, থাকেন

আমীর-ই-হাজীব অর্থাৎ উৎসব-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রবর্তনের সর্বময় কর্তৃত্ব যার হাতে। সুলতানের ঠিক পিছনে নিজের অস্তিত্বকে প্রায় গোপন রেখে উপস্থিত থাকেন সর-ই-জানদার; তিনি সুলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক—যার চোখের সামান্য ইশারায় প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে কয়েক'শ বাছাই সৈন্য। দরবার কক্ষের শোভাবর্দ্ধন করবার জন্য এছাড়াও প্রতিদিন আগমন ঘটে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ধনী সদাগরের।

বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলিতে সুলতান নিঃসন্দেহে এক অতি আকর্ষক চরিত্র। সেই সব মহার্ঘ দিনে রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে তার চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি পরিস্ফুট হয়। তার আশ্চর্য ভদ্রতা, নম্রতা এবং নৈতিবোধের দৃষ্টান্ত সভাসদদের হতবাক করে দেয়। গণিত, কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ এবং ইতিহাসে সুলতানের অসাধারণ পাণ্ডিত্য তার প্রতিকথার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পার্ষদেরা তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই চির-অপরিচিত মানুষকে লক্ষ্য করেন শুধু।

কোনকোনদিন সুলতান একাই হাস্য-পরিহাসে লঘু করে তোলেন পরিবেশ। সময় তখন লঘুপক্ষ প্রজাপতির ডানায় ভর করে যেন উড়ে যায়। সুলতানের মধ্যে তখন সেই অসম্ভব দাম্ভিক, ক্রোধী, নৃশংস মানুষটার ছায়ামাত্রও ধরা পড়ে না। উজীর মন্ত্রী, আমীর-ওমরাহদের বুকের উপর থেকে একটা ভারী পাথর যেন নেমে যায়। সুলতানের উর্বর মস্তিষ্ক ভবিষ্যতের বহু পরিকল্পনা নিয়ে স্বপ্নজাল বোনে। তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তখন তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুচ্ছটার মতো ঝলসে ওঠে।

এমন এক সুন্দর দিনে সকলেই উপস্থিত ছিলেন দরবার কক্ষে। হাস্য-পরিহাস, তর্ক-বিতর্ক, বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে সাম্প্রতিক

রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও আরো নানা বিষয়ের আলোচনার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। সকলেই মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন যে জুনা খাঁর অমোঘ ব্যক্তিত্ব দরবারের আবহাওয়ায় নূতন প্রাণসঞ্চার করেছে। সব কিছুই ঢেলে সাজাচ্ছেন তিনি, তবু সবকিছুই সুন্দর।

সহসা সমস্ত আলোচনার অভিমুখ কৌশলে ঘুরিয়ে দিলেন সুলতান মহম্মদ। প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন সেই সব বিশিষ্ট বিদেশীয় অতিথিদের সম্বন্ধে যারা কিছুদিন পূর্বেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে রাজধানীতে পদার্পণ করেছিলেন। উপলক্ষ্য ছিল নূতন সুলতানের সিংহাসনাভিষেক।

তাদের কথা ভুলতে পারেন নি দরবারের কেউই। সকলেরই পরিষ্কার মনে আছে খোরাসান, ইরাক, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে সম্রাটদের শুভেচ্ছাবাণী এবং বিপুল পরিমাণ উপঢৌকনসহ বহুসংখ্যক প্রতিনিধিই উপস্থিত হয়েছিলেন অভিষেক উৎসবে। মহম্মদও আতিথ্যের ত্রুটি করেন নি। ধনভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন অতিথি সেবায়।

সুতরাং বিদেশাগত অতিথিদের সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাতে সকলেই খুব উৎসাহিত বোধ করতে থাকেন। তাদের হৃদয়ের বদান্যতা, ব্যবহারের মাধুর্য, উপঢৌকনের অপরিমেয়তা, পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য—সমস্ত বিষয়ের উপরই আলোচনা চলতে লাগল। উপস্থিত সকলেই কিছু-না-কিছু মন্তব্য করবার চেষ্টা করলেন। এই সব অতিথিদের আচার-আচরণ সুলতানকেও যে যথেষ্ট খুশী করেছে এ বিষয়ে কারো মনেই বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

প্রথমদিকে আলোচনার সূত্রপাত করে দেবার পর থেকে সুলতান

আর কোন কথা বলেন নি। তিনি ছিলেন নীরব শ্রোতার ভূমিকায়। হঠাৎ তার কণ্ঠে ভাষা ফুটল, পারস্য, ইরাক, খোরাসান থেকে যে সব বিশিষ্ট বিদেশী নাগরিক আমার দরবারে এসেছিলেন তাদের আপনার কেমন লেগেছে উজীর?

উজীরের শ্বেত শ্মশ্রুচ্ছাদিত মুখমণ্ডলে হাসি ফুটল কিনা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তিনি যখন কথা বললেন তখন তার কণ্ঠে খুশীর মনোভাব অপ্রকাশ রইল না। বললেন; মেহেরবান খোদাতালা মহামান্য সুলতানকে দীর্ঘজীবী করুন। পারস্য, ইরাক, খোরাসান থেকে আগত সকল রাজপুরুষের মনের ঔদার্যই আমাদের মুগ্ধ করেছে। ওরা সর্ব বিষয়েই প্রশংসার যোগ্য।

—ঠিক তাই, এ সম্বন্ধে সম্ভবত দরবারে কারো মনেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সুলতানের বজ্রকণ্ঠ সভাকক্ষের চতুর্দিকে গম গম করতে থাকে।

অতঃপর ক্ষণিকের নীরবতা সেই নীরবতা। সুলতানই ভঙ্গ করলেন আবার, উজীরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন; মান্যবর উজীর প্রথমে আমার প্রশ্নের সঠিক অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন—পরে উত্তর দেবেন। আচ্ছা, ওদের প্রদত্ত উপঢৌকনের এই যে বাহুল্য এটা কি চোখে আঙুল দিয়ে কিছু একটা দেখিয়ে দিচ্ছে না আমাদের? আপনার কি মনে হয়?

বিচিত্র মানুষ মহম্মদের বিচিত্র প্রশ্ন।

সুলতানের হৃদয়ভেদী দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য উজীরের মুখের উপর প্রত্যাশায় থমকে থাকে। তারপর দিওয়ান-ই-আরিজের দিকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করেন; দিওয়ান-ই-আরিজ, অসংখ্য সৈন্যের কর্তৃত্ব আপনার হাতে। আশা করব, আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আপনি সক্ষম হবেন।

সৈন্যাধ্যক্ষের মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে অতিশীতল এক ভয়ের অনুভূতি প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি ভাষা খুঁজে পান না।

আশ্চর্য! একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যায় সুলতানের কণ্ঠে। দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে দিওয়ান-ই-ইনশার মুখের উপর নিবদ্ধ করেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ থেকে কটি কথা উচ্চারিত হয়: আপনি পারেন কি এর উত্তর দিতে? দিওয়ান ই-ইনশা?

কিছু একটা বলা দরকার, দিওয়ান-ই-ইনশা বুঝতে পারছিলেন। শুধু নিজের হিতার্থে নয়—উপস্থিত সকলের হিতার্থে। ভয়কম্পিত কণ্ঠস্বরে তিনি উত্তর দিলেন; এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ওদের রাজকোষে প্রচুর সম্পদ আছে। প্রতিটি দেশই অত্যন্ত ধনশালী।

—চমৎকার, চমৎকার দিওয়ান-ই-ইনশা, আমি প্রীতিলাভ করলাম। আপনার কথা যথার্থ। আপনি ঠিকই বলেছেন এর থেকে এটাই একমাত্র প্রমাণ হয় যে ওদের রাজকোষে প্রচুর সম্পদ আছে। প্রতিটি দেশই অত্যন্ত ধনশালী। অথচ আমাদের? অর্থের প্রাচুর্য তো দূরের কথা—পদে পদে তার অভাব আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। তাই যার রাজকোষে যথেষ্ট সম্পদ নেই, আমার হিসাবে তার পবিত্র কর্তব্য হল যার অনেক আছে তার থেকে কিছুটা সংগ্রহ করে নেওয়া। আমাদের ঠিক সেটাই করতে হবে ভবিষ্যতে।

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল সুলতানের কণ্ঠ।

—কিন্তু ওদের দেশ বহু দূরে অবস্থিত, আমরা কেমনভাবে ওদের রাজকোষ থেকে সম্পদ আহরণ করব? স্বস্তির উজীর সহসাই বিব্রত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ফেললেন।

—আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার পর কোনদিনই আমার যথেষ্ট আস্থা

নেই। কিন্তু তাই বলে এতখানি নির্বুদ্ধিতার প্রশ্নও যে আপনি উচ্চারণ করতে পারেন তা আমি কখনও ভাবিনি। বিদ্রূপে শাণিত শোনায় সুলতানের কণ্ঠ। বলে চলেন; আমরা প্রার্থী হয়ে চাইলেই ওরা দেবে না। কেউই তা দেয় না। তাই আমাদের শক্তি প্রয়োগ করে কেড়ে নিতে হবে।

—তার অর্থই তো সমর-অভিযান? নায়েবের কণ্ঠে অর্ধোচ্চারিত রয়ে যায় প্রশ্নটা।

—হ্যাঁ, সমর-অভিযানই। আপনারা সকলে শুনে রাখুন, একদিন আমার সেনাবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করবে খোরাসান আর ইরাকের বিরুদ্ধে। ঐ সব দেশের যে-সব রাজ-প্রতিনিধিরা কিছুদিন পূর্বেই এখানে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শও হয়েছে। বিদায় গ্রহণের পূর্বে তারা আমাকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেছেন। অবশ্য অভিযানের সময় এখনই আসেনি—কিন্তু তার পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া তো প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখেন সুলতান মহম্মদ। সমস্ত দরবারকক্ষে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করে।

—দিওয়ান-ই-আরিজ? সুলতানের কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হয়।

—আদেশ করুন জনাব। সঙ্গে সঙ্গে সরব হন সৈন্যাধ্যক্ষ। পূর্ব-প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অক্ষম হয়েছেন, সেই ত্রুটি এবার যদি ঢেকে নিতে পারেন।

—দিওয়ান-ই-আরিজ, আপনি সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তা। তাই সৈন্যদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব আপনারই। শুধু দায়িত্বই বা বলি কেন, এ আপনার কর্তব্য। আর সে বিষয়ে আপনাকে আমি নতুনভাবে সচেতন করে দেওয়ারও বিশেষ কারণ দেখি না।

—শাহান্‌শা, আমার কর্তব্যকর্মে আমি সর্বদাই অটল। কিন্তু…

—কিন্তু? থামলেন কেন দিওয়ান-ই-আরিজ? আপনার বক্তব্য নির্ভয়ে শেষ করুন। সৈন্যাধ্যক্ষকে বরাভয় প্রদান করলেন সুলতান।

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে এবার দিওয়ান-ই-আরিজ তার বক্তব্য উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হলেন। বললেন; আপনার এই ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু মহামান্য উজীরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমি যতদূর জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে আমাদের রাজকোষে অর্থের ততখানি প্রাচুর্য নেই। তাই এ বিষয়ে আমি শাহান্‌শার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মহম্মদ নীরবে শ্রবণ করলেন দিওয়ান-ই-আরিজের বক্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। সাময়িক বিরতির পর তার কণ্ঠ শোনা গেল; আপনি সঠিক স্থানেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি গভীরভাবেই চিন্তা করছি। দরবারে যারা উপস্থিত আছেন তারা সকলেই বিলক্ষণ জানেন যে গণিত শাস্ত্রে আমার সামান্য অধিকার আছে। সেই গণিত শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকরী করে তুলতে মোটামুটি কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার একটা হিসাবও তৈরী করেছি আমি। হ্যাঁ, বিপুল পরিমাণ অর্থই চাই। অথচ রাজকোষে দৈন্য। দৈন্য একটা ব্যাধি। এই ব্যাধিকে নিরাময় করতেই হবে। আর কিভাবে সেটা সম্ভব আপনাদের প্রত্যেকেই তা চিন্তা করুন। এটা আপনাদের যৌথ দায়িত্ব। পরদিন সভাগৃহে এই বিষয়ের উপরই আলোচনা হবে।

বক্তব্য শেষ করে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে দরবারকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন সুলতান। উপস্থিত অন্য সকলে বসে রইলেন চিত্রার্পিতবৎ। সকলের মনের মধ্যে একটা কথাই গুমরে গুমরে উঠছিল তখন। একমাত্র জুনা খাঁর পক্ষেই বোধহয় সম্ভব অনুরূপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখা। একমাত্র মহম্মদের পক্ষেই।

রাজদরবারে কয়েকদিনের উপস্থিতিতেই যারা সকলের চোখে অসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, যাদের হাতে কদিন আগেই বাঁধা হল সখ্যতার রাখী—তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু কে উচ্চারণ করবে এই স্পর্দ্ধিত প্রশ্ন। না, সুলতানী দরবারে এতখানি সাহস কারো নেই।

স্বাভাবিক কারণেই পরবর্তী দিনে দরবারের কাজ শুরু হয় একটা বুকচাপা অস্বস্তির মধ্যে।

সকলেই যেন মনে মনে তৈরী হয়ে এসেছেন ভয়ানক কোন এক প্রস্তাব শোনার জন্য, কিন্তু তার সঠিকরূপ কি হতে পারে কারো মনেই সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

যথাসময়ে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দরবারকক্ষে প্রবেশ করলেন। মুখাবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। দেখেই অনুমান করা যাচ্ছিল তিনি কোন এক নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

সকলের আনত অভিবাদনের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন সুলতান। সকলের মুখের উপর শীতল দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর গতদিনের অসমাপ্ত আলোচনার সূত্র ধরে সমস্ত দরবারের উদ্দেশ্যে তার কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল; গতকাল আপনাদের সকলের সামনে আমি একটা সমস্যা রেখে গিয়েছিলাম। রাজকোষের দৈন্য আমরা কোন্ কোন্ উপায়ে দূর করতে পারি? এ বিষয়ে আপনাদের চিন্তাও

করতে বলেছিলাম। আশা করি দু-একজন অন্তত কিছু প্রস্তাব দিতে পারবেন এ বিষয়ে।

নিস্তব্ধ দরবারের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সুলতানের শ্যেনদৃষ্টি উত্তরদানে সক্ষম এমন মুখ খুঁজে খুঁজে ফিরতে থাকে। কিন্তু সমস্ত মুখই যেন মৃতমানুষের মুখ। সুলতানের মনে হয়, দরবারকক্ষ যেন কোন অদৃশ্য কারণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

—আশ্চর্য! মহম্মদের বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তারপর শ্লেষ মিশ্রিত তীব্র স্বরে তিনি বলতে শুরু করেন; আমি নিজেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, আপনারা শ্রবণ করে আমাকে ধন্য করুন। অতঃপর সাময়িক নীরবতা।

—হ্যাঁ, প্রথম এবং উৎকৃষ্ট উপায় হল আপনাদের মতো কতগুলি অপদার্থ রাজ কর্মচারীকে নিয়মিত বৃত্তিদান করতে রাজকোষ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়মিত ব্যয়িত হয়—তার পরিমাণ হ্রাস করা। নয় কি?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই, উত্তর হয় না। নিরুত্তর থাকেন সকলে। বাধ্য হয়েই থাকতে হয়। গতকাল থেকে সুলতানের কোন প্রশ্নেরই কোন সদুত্তর দিতে পারছেন না কেউ—সুতরাং এটুকু ব্যঙ্গ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

—হ্যাঁ, দ্বিতীয় উপায়,······এবার আরো কুটিল শোনায় সুলতানের কণ্ঠ; দোয়াবের রাজস্ব বৃদ্ধি করা। আপনারা সবাই জানেন দোয়াব গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল। সেখানকার জমি অত্যন্ত উর্বর পলিমাটি দিয়ে গঠিত। উপরন্তু পানির সেখানে অভাব নেই। তাই দোয়াবের মানুষের যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করা উচিত। আর তা যদি সত্য হয় তবে আমার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের প্রজাদের তুলনায় অধিক পরিমাণ করই বা তারা দেবে না কেন?

হ্যাঁ, এবার থেকে তাই তাদের দিতে হবে।

অমোঘ নিয়তিই যেন কথা বলে ওঠে সুলতানের কণ্ঠে। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করে বোঝেন বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে দরবারকক্ষে। অনুমান করা যায়, কেউ তাহলে অখুশী নয় এ প্রস্তাবে।

খুশী হবার কারণ ছিল বইকি?

দোয়াবের অধিকাংশ প্রজাই হিন্দু। তারা জিম্মী। সুলতানী শাসন ব্যবস্থায় তাদের নামমাত্র নাগরিক অধিকার আছে মাত্র। কিন্তু তাও তাদের থাকা উচিত নয়। কোরাণের এই বিধান। হয় তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করুক, না হলে সহ্য করুক অত্যাচার আর নিপীড়ন। হিন্দুরা শাসিত—মুসলমান শাসক।

স্মরণ করা যেতে পারে, শাসিতের প্রতি শাসকের এই মনোভাব দীর্ঘ কয়েকশ বৎসর ধরে হিন্দুস্থানের নিরীহ মানুষের বুকের উপর উদ্যত হয়ে ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের শুরু থেকেই চলছিল এই বৈষম্যমূলক আচরণ। ধর্মান্তরিত হবার জন্য নানা প্রলোভন দেখানো হত হিন্দুদের। বস্তুত, সমগ্র হিন্দুস্থানকে মুসলমান শাসকেরা ভাবতেন 'দারুল-ই-হার্ব' বলে এবং তাদের স্বপ্ন ছিল একে 'দারুল-ই-ইসলামে' রূপান্তরিত করা।

তখনকার দিনে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন মুসলমান অভিজাতেরা নানা শোষণমূলক কার্যকলাপে এবং নারী-নির্যাতনে হাত কলঙ্কিত করে স্ফীত হতেন আত্মগরিমায়। তাদের কাজে অন্ধ সমর্থন ছিল তথাকথিত সুলতানদের।

অবশ্য দু-এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও যে লক্ষ্য করা যেত না তা নয়। এরই মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে ধর্মসহিষ্ণু কোন সুলতানের আবির্ভাব

ঘটলে অবস্থায় আংশিক পরিবর্তন ঘটত। কিন্তু এই অবস্থাগত পরিবর্তন ছিল খুব সাময়িক।

সুতরাং মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের এই অভিনব প্রস্তাব খুশী করে তুলল দরবারে উপস্থিত প্রায় সকল ব্যক্তিকেই। বিধর্মীদের প্রতি জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার এমন সুযোগ ক'বার আসে? অবশ্য সবাই যে খুশী হলেন এমন নয়। দরবারের মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান মানুষের মন দোয়াবের নিঃস্ব প্রজাদের প্রতি সহানুভূতির অশ্রুও বিসর্জন করল। তারা বুঝলেন এটা অন্যায়, তবু প্রতি-বাদের একটি কথাও উচ্চারণ করার সাহস কেউ অর্জন করতে পারলেন না।

কিন্তু হৃদয়ের গভীরে সত্যকে অস্বীকার করার পথ কোথায়?

একথা হয়তো মিথ্যা নয় যে প্রকৃতি অনুকূল থাকলে দোয়াবের কৃষক সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকের তুলনায় বেশী ফসল ঘরে তোলে। কিন্তু গত দু-বছর ভয়ানক খরায় দোয়াবের মাটি হয়েছে মরুভূমির মতো রুক্ষ। কোথাও কোন সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে দোয়াবের মাটিতে। এমন অবস্থায় প্রজারা কেমন করে শুধবে বর্দ্ধিত হারে প্রাপ্য কর?

কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দুর্বল কণ্ঠ কি পৌঁছবে সিংহাসনে আসীন ঐ প্রচণ্ড দাম্ভিক মানুষটির কানে? কোন আশা নেই। দোয়াবের প্রজাদের সমর্থনে তাই কারো মুখর হয়ে উঠবার সাহস নেই, বিশেষ করে যেখানে দরবারে উপস্থিত প্রায় সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকই স্বাগত জানাচ্ছেন এই প্রস্তাবে।

দোয়াবের অসংখ্য প্রজা অর্দ্ধাহারে-অনাহারে এই পৃথিবীর বুকের থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই বা কি? সভাসদেরা নিজের নিজের স্বার্থচিন্তা নিয়েই মগ্ন। উচ্চপদের অভ্রংলিহ অহমিকায় ওরা

স্ফীত। একমাত্র উদ্দেশ্য ওদের সুলতানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করা। ওদের মধ্যে কেউ বা আমীর, কেউ বা মালিক পদমর্যাদা সম্পন্ন; আবার কেউ বা খান। দোয়াবের মানুষ মরলে ওদের পদগৌরব হ্রাস পায় না একটুও। তাছাড়া বিধর্মী হিন্দুপ্রজা যত কমে তুর্কী-আফগান শাসনের পক্ষে তত মঙ্গল।

তাই দরবারকক্ষের কোন আসন থেকেই উচ্চারিত হল না একটিও প্রতিবাদের ভাষা। দোয়াবের অসংখ্য অসহায় হিন্দুপ্রজার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হয়ে গেল সেদিন।

সুলতান এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে দরবারকক্ষে উপস্থিত মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন। হ্যাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক যে হিন্দুস্থানের শাহান্‌শা যে রায় উচ্চারণ করবেন সর্ব-সম্মতিক্রমে তা গৃহীত হবে। আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল সুলতানের মুখের উপর। দীর্ঘ নীরবতার পর তার কণ্ঠ মুখর হল।

—দিওয়ান-ই-ইনশা?

—আদেশ করুন শাহন্‌শা।

—আপনি তো সবকিছুই শুনলেন। প্রস্তাবটা কেমন লাগল আপনার?

মহম্মদের কণ্ঠে যেন মৃদু কৌতুকের আভাস।

—অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব জনাব। অথচ দেখুন, ভূতপূর্ব অন্যকোন সুলতানের মনেই এ জাতীয় চিন্তা কখনও জাগ্রত হয় নি।

অত্যন্ত সাবধানে সামান্য চাটুকারিতা করে নিলেন দিওয়ান-ই-ইনশা।

মহম্মদের মুখ দেখে মনে হল প্রসন্নমনেই তিনি এই স্বীকৃতিটুকু গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন; হ্যাঁ, আপনাকে যা বলছিলাম। বারিদ-ই-মামালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক সাতদিনের মধ্যে

আপনি করবৃদ্ধির এই আদেশনামা রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করার ব্যবস্থা করুন। মনে থাকে যেন, ঠিক সাতদিনের মধ্যে এবং রাজ্যের সর্বত্র।

—আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে; আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন দিওয়ান-ই-ইনশা।

কিন্তু সাতদিনের অনেক আগেই বাতাসের মুখে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল এই বিপদবার্তা। ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে মানুষ যেমন তার সমস্ত আত্মসচেনতা হারিয়ে স্থানুবৎ পড়ে থাকে করবৃদ্ধির এই দুঃসংবাদ দোয়াবের প্রজাদের উপর ঠিক তেমনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। একটা ভয়ংকর ঝড়ের অপেক্ষায় ওরা এতদিন প্রহর গুণছিল. সেই ঝড় এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে, মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে।

(তিন)

দোয়াবের আবালবৃদ্ধবনিতার কানে করবৃদ্ধির আদেশনামা পৌঁছে গেছে এখন। এবার প্রচারকার্যে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন দিওয়ান-ই-ইনশা এবং বারিদ-ই-মামালিক। দুজনেই আশা করছেন, সুলতানের তরফ থেকে বিশেষ কোন পুরস্কার পাবেন কর্মদক্ষতার অঙ্গীকার হিসাবে।

করবৃদ্ধির আদেশ-সম্বলিত হস্তলিখিত অজস্র প্রচারপত্র প্রাচীর-গাত্রে, বৃক্ষকাণ্ডে, প্রস্তরফলকে লটকে দেওয়া হয়েছে। ঘোষকেরা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রচার করেছে মেহেরবান সুলতানের নূতন আদেশ-বার্তা।

দোয়াবের অসংখ্য প্রজা চোখ চেয়ে দেখেছে প্রচারপত্রগুলি, কান পেতে শুনেছে সেই ঘোষণা। এসবের প্রকৃত অর্থই যেন প্রথম প্রথম ওদের বোধগম্য হয় নি। তারপরই হাহাকার করে উঠেছে অগণ্য ভীত মানুষ। পরিত্রাণের আশায় আকাশে হাত তুলে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেছে।

কিন্তু ওদের জন্য আকাশ থেকে কোন আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হয় নি। ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাস মৃত্যুর শীতলতা নিয়ে ওরা চেয়ে চেয়ে দেখেছে।

ভাগ্যের পরিহাস বইকি? না হলে এমন হবে কেন?

দোয়াবের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে আজ দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। গত

ক'বছরের অনাবৃষ্টিতে উর্বর শস্যক্ষেত্রগুলি এখন পাথরের মতো কঠিন। কোথাও নেই এককণা তণ্ডুল। কোথাও নেই এককণা শ্যামলিমার স্পর্শ। এমনকি সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহে দগ্ধ হয়ে গেছে তৃণক্ষেত্রগুলি। অসহায় গৃহপালিত পশু খাদ্যের অভাবে হাজারে হাজারে মারা পড়ছে। নিরন্ন দোয়াববাসী কাঁদছে একমুঠো অন্নের জন্য।

রাজকোষের প্রাপ্য গত দু-সনের রাজস্বই অধিকাংশ প্রজা পরিশোধ করতে পারে নি। তার উপর বর্দ্ধিত হারে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল তাদের দুব্জ পৃষ্ঠে। কেমন করে তারা সেই ভার বহন করবে কিম্বা মোটেই তারা সে ভার বহনক্ষম কিনা—একথা একবারের জন্যও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করল না কেউ।

দোয়াবের ঘরে ঘরে আজ নিরন্ন মানুষের হাহাকার। প্রায় প্রতিটি মানুষ আজ দুর্ভিক্ষের শিকার। এই চরম দুর্দিনে দোয়াবের অগণিত প্রজার সামনে একমাত্র বাঁচার পথ ছিল রাজানুগ্রহ। সুলতানের হাত যদি অকৃপণ দাক্ষিণ্যের হাত হয়ে উঠত একমাত্র তবেই তারা বাঁচার আশা করতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে এ কি হল? তাদের সেই আশাকে সমূলে বিনষ্ট করে এ কি নেমে এল অদৃশ্য হাতের কুঠারাঘাত? এখন সেই নির্ম্মম আঘাতের তলায় মাথা নত করে চরম দিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর পথ কোথায়?

তাই করল ওরা। উচ্চারণ করল না একটিও প্রতিবাদের ভাষা। ওরা প্রতিবাদ জানে না।

তবু সেই ওদের দিয়েই প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করাতে চায় ইন্দ্রনাথ। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে ওর সাক্ষাৎ মেলে। দোয়াবের নির্বাক প্রজাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার চায়। অসহায় আত্মসমর্পণের জন্য তৈরী মানুষগুলোকে চেতনায় আঘাত দিয়ে দিয়ে

জাগিয়ে তুলতে চায়। বড় দুঃখে বলে উঠে; চাবুক দিয়ে তোমাদের ছাল ছাড়িয়ে নিলেও চাবুকটা চেপে ধরতে পারবে না, এ কেমন কথা? মরতেই তো বসেছি আমরা, তার আগে অন্তত একবারের জন্যও মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ করেই দেখি না।

দোয়াবের প্রতিটি রায়ত প্রজাই ইন্দ্রনাথকে তাদের পরম আত্মীয় বলে মানে। ওরা জানে ওদের নিয়েই ইন্দ্রনাথের অষ্টপ্রহরের চিন্তা; তাদের আনন্দে ওর আনন্দ, তাদের দুঃখে ও সমব্যথী। তাই যদি না হবে তবে কেন ইন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো দোয়াবের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে? কেন কাছের মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে নিজের শস্যাগারের যাবতীয় শস্যের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত?

যখন-তখনই ভীত মানুষগুলোকে উজ্জীবিত করার জন্য বলে ওঠে; কোথা থেকে দেবে কর? একমুঠো অন্নের সংস্থান নেই, চারদিকে দুর্ভিক্ষ, চাইলেই হল কর। সবাই মিলে একসঙ্গে বল, কর দেবার আমাদের সামর্থ্য নেই। কর বাড়ানো তো দূরের কথা, আগের পাওনা করও মকুব করো। আমাদের এই চরম বিপদে আমাদের সাহায্য দাও।

কথাগুলো বলে ইন্দ্র টান-টান হয়ে দাঁড়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষগুলোর সামনে। ওদের চোখের গভীরে তাকিয়ে থাকে সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। একটা স্ফুলিঙ্গও কোনখানে মুহূর্তের জন্য জ্বালাতে পারল কি না তার অনুসন্ধান করে।

আসলে দুর্বলচিত্ত প্রজাদের রক্তের গভীরে প্রতিরোধের বীজ বুনে দিতে চায় সে। অসাধ্যসাধনে ব্রতী ইন্দ্র।

সমস্যাটা নিয়ে কদিন ধরেই চিন্তাভাবনা করছে ইন্দ্রনাথ। না, এখন অন্যকোন পথ নেই। এই মানুষগুলোকে যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তবে এদেরই প্রতিবাদে মুখর করে তুলতে হবে।

করসংগ্রহের নামে রাজকর্মচারীরা এখনও অত্যাচার শুরু করেনি ঠিকই—কিন্তু শীঘ্রই শুরু হবে নির্যাতন। ইন্দ্রনাথ স্পষ্ট চোখের সামনে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছে।

আসলে করবৃদ্ধি করা হয়েছে চতুর্গুণ। কিন্তু ইন্দ্র জানে সংগ্রাহকেরা দাবী করবে দ্বাদশগুণ। অসহায় দোয়াববাসী ব্যর্থ হবে কর দিতে। তখন নিষ্ঠুর নিয়তির অভিশাপের মতো নেমে আসবে জঘন্য নির্যাতন। স্থানীয় জমিদার এবং মহাজনেরা তখন হাত মেলাবে করসংগ্রাহকদের সঙ্গে।

পরবর্তী পাশার চাল ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে জল্ জল্ করে। এর প্রতিবিধানের একমাত্র পথ প্রতিবাদ করা—বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সমষ্টিগতভাবে। একমাত্র তখনই সেই বজ্রধ্বনি পৌঁছতে পারে আত্মদম্ভী সেই সুলতানের কর্ণে যে এই দুর্বিপাকের জন্য মূলত দায়ী।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের সমস্ত প্রচেষ্টাই ওদের নিষ্ক্রিয়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ। প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে, হ্যাঁ, এই তোমাদের দরকার—চাবুক। চাবুক খেতে খেতেই জন্ম—সেই চাবুক খেতে খেতে মরতেও হবে। এই তোমাদের ভবিতব্য। কে বাঁচাবে তার হাত থেকে?

তবু ওরা নির্বাক চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে। আর ভাবে।

কই তাদের মতো সর্বশান্ত মানুষগুলোর জন্য অন্য কেউ তো এমনভাবে চিন্তা করে না। ওর কি স্বার্থ তাদের মতো মানুষদের পাশে এসে দাঁড়াবার? তাদের মনে সাহস যোগাবার?

দোয়াবের প্রতিটি মানুষ জানে রাজার ঐশ্বর্য ইন্দ্রনাথের। এই অঞ্চলের দক্ষিণপ্রান্তে এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে তার জায়গীর। নাম ধাত্রীগড়। সেখানে বিশাল প্রসাদের অভ্যন্তরে চরম সুখ-

সম্ভোগের মধ্যে দিয়েই তো কাটতে পারে ওর জীবন। অভিজাত মানুষের পক্ষে যেটা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সেই দুর্বার প্রলোভনকে হেলায় অস্বীকার করে এই যুবক কেন ফিরে ফিরেই ওদের মধ্যে নেমে আসে আর ঘুমভাঙ্গানী গান গায়—দোয়াবের মানুষ কিছুতেই বুঝে ওঠে না।

ইন্দ্রনাথ ওদের চোখে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার বস্তু হয়েই থাকে। অবোধ্য বিস্ময়ে ওরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে ফেরে শুধু। আসলে, এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ওকে চিনতে পারে না। ভুল করে ফেলে বার বার। যতবারই ওর বিচার করতে যায় হয় তা করে নিজেদের মাপকাঠিতে নতুবা অভিজাতদের। নিজেদের সঙ্গে তুলনায় ওর দুরন্ত ব্যক্তিত্বের আড়ালে ওরা হারিয়ে যায়; আকাশকুসুম কল্পনা করে দিশাহারা বোধ করে। আবার যখন অভিজাতদের সঙ্গে ওর তুলনা করতে চায় তখনও মাপে এঁটে উঠতে পারে না। অভিজাত মানুষদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের আসমান-জমিন ফারাক ওদের মনে অনন্ত বিস্ময়ই সৃষ্টি করে শুধু।

তাই ইন্দ্রনাথের কথা শুনে মনের গভীরে ওরা একটু আশার আলো দেখে হয়তো কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে রাজাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মতো অসম্ভবকে তাদের মতো সাধারণ নিপীড়িত মানুষও সম্ভব করে তুলতে পারে।

(চার)

কয়েকশত বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ দোয়াবভূমি, এর উত্তরে দিল্লী, পূর্বে গঙ্গাবিধৌত সমভূমি, পশ্চিমে যমুনা। গঙ্গা-যমুনা দক্ষিণে ক্রমশ নিকটবর্তী হতে হতে মিলনতীর্থ রচনা করেছে প্রয়াগে এসে।

এই বহুখ্যাত প্রয়াগ তীর্থ থেকে উত্তরে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এক রাজপথ, এই পথ ধরে দুগ্ধ ধবল অশ্বে আরোহণ করে এক অশ্বারোহী যখন দুরন্ত গতিতে পথের ধূলা উড়িয়ে চলে যায় তখন নিম্ন-দোয়াব অঞ্চলের যে কোন পথচারীই বলে দিতে পারে এই অশ্বারোহীর নাম কি বা নিবাস কোথায়।

ওরা জানে দোয়াব-অঞ্চলের অন্য কোন সওয়ারেরই এত দ্রুত অশ্বধাবনের ক্ষমতা নেই; রাজধানী দিল্লীতেও সমতুল্য কোন অশ্বারোহী আছে কি না সন্দেহ।

তারপর একসময় দিক চক্রবাল রেখার ওপারে সওয়ারী সমেত চলমান অশ্বটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি শ্বেতবিন্দুর মতো যখন দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যায় তখন সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর এক দীর্ঘদেহী বীরপুরুষের পৌরুষব্যঞ্জক মুখচ্ছবি। ইন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথের।

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষ মাথা নত করে শ্রদ্ধা-নিবেদন করে মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে। ওদের মনের মধ্যে স্মৃতি যেন কথা বলে ওঠে।

মনে পড়ে, ইন্দ্রনাথের স্বর্গতঃ পিতা মহেন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন সৈনিক। প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন সেই সমরক্ষেত্রেই। মৃত্যুবরণ করলেন,—কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হয়ে নয়, জয়লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করে। পরাজয়ের অপমান স্পর্শ করতে পারে নি তাকে। কতদিনেরই বা কথা সেসব?

মহেন্দ্রনাথের স্মৃতি ওদের মনোজগতে আজও অম্লান।

অথচ কয়েকবছর পূর্বেও দোয়াববাসীরা মহেন্দ্রনাথকে চিনত না পর্যন্ত। তিনি এই অঞ্চলের মানুষই ছিলেন না। তার মাতৃভূমি ছিল তিরহুট। জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই কেটেছিল সেখানে। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের আমন্ত্রণে তিনি রাজধানী দিল্লীতে পদার্পণ করেন।

তারপর শেষের কয়েকবছর কেটেছিল দোয়াবের মাটিতে। স্থানীয় মানুষ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করত তাকে—তিনিও তাদের গভীর অপত্যস্নেহেই বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

মহেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী এক সময় সকলের মুখে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। অবশ্য একদিনেই জানা হয় নি সবকথা কারণ মহেন্দ্রনাথ নিজমুখে কোনদিনই একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি নিজের সম্বন্ধে। আসলে নিজের কথা সংগোপনে লুকিয়ে রাখতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তবুও বিভিন্ন সূত্রে সেই কথা প্রকাশ পেয়েছিল। কিছুই শেষপর্যন্ত অজানিত থাকেনি।

দিল্লী নগরীর বুকে মহেন্দ্রনাথের প্রথম পদার্পণ ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে, সেই যেবার দিল্লীর অন্তরাত্মা ফুঁসে উঠেছিল এক যুদ্ধেচ্ছু সৈনিকের মতো। লখনৌতি কিছুতেই দিল্লীর শাসন মানছেনা, সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। সুতরাং সেই বিদ্রোহের আগুন চিরতরে নিভিয়ে দেবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করতে হবে সুলতান

গিয়াসুদ্দিনকে। সাজ-সাজ রব উঠেছিল চতুর্দিকে। অশ্বশালার সর্বে-সর্বা আমীর-ই-আখুর, হস্তীশালার সর্বময় কর্তা শাহনা-ই-পিলান অনেকদিন পর যেন যোগ্য কাজ পেয়ে ধন্য মনে করেছিলেন নিজেদের।

দিওয়ান ই-আরিজের উপর অসংখ্য সৈন্যের গুরুদায়িত্ব—সেই দায়িত্ব যথা-যোগ্যভাবে পালন করবার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ঘুচে গিয়েছিল তার দিনের বিশ্রাম, রাতের নিদ্রা। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ যাত্রার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বিভাগীয় কর্মচারীরা দিবারাত্র পরিশ্রম করতে তখন একটুও দ্বিধা করেন নি। অবিশ্বাস্য স্বল্পকালের মধ্যে সমস্ত কর্ম-যজ্ঞ সমাধা হয়েছিল।

তারপর এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছিল অসংখ্য পদাতিক সৈন্য। সঙ্গে দশসহস্র অশ্বারোহী এবং দশসহস্র গজ। মানুষ আর পশুর সম্মিলিত পদক্ষেপে সেদিন উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল পথের ধূলি, সেই ধূলি ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল প্রভাত বেলায় নবারুণ বালার্ক। অবশেষে ধূলার আবরণ অপসারিত হবার পর মনে হয়েছিল যেন এক দানবাকৃতি ময়াল তার আদিগন্ত বিস্তৃত দেহ নিয়ে শিকারের সন্ধানে চলেছে। তারপর যখন দূর থেকে দূরে দৃষ্টিসীমার পরপারে হারিয়ে গিয়েছিল শেষ সৈনিকের দেহটিও তখন দিল্লী নগরী চোখের জলে বিদায় জানিয়েছিল সেনাদলকে।

পরবর্তী তিনমাসাধিককাল সময় রাজধানী দিল্লী যেন প্রোষিতভর্তৃকা নারীর মতো বিরহ যাপন করল। আর দরবার অলংকৃত করে সুলতান গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে উপবেশন করেন না। দিল্লীর শাসনভার সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খাঁর হাতে। সমস্ত

যন্ত্রটাই চলছে সঠিকভাবে, তবু কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটছে বলে মনে হয়।

সারা নগরী যেন বিরহে মুহ্যমান। দিনশেষে প্রাসাদে ঠিক তেমন ভাবেই উজ্জ্বল আলো জ্বলে। চতুর্দ্দিকে সেই হাজার ঝাড় বাতির রোশনাই,—তবুও মনে হয় সেই ঔজ্জ্বল্যে কোথায় যেন অভাব। হারেমের অভ্যন্তরে রূপসীদের সজ্জার পারিপাট্যেও যেন ঈষৎ শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। ঘন-ঘন আর সচকিত হয়ে উঠতে হয় না তীক্ষ্ম ছুরিকাধারিণী হারেম-প্রহরিণীদের।

কোথাও যেন আর কিছু আলোচনা করারও নেই। সবাই যেন উন্মুখ প্রতীক্ষা নিয়ে একটা সংবাদের দিকেই চেয়ে আছে। জলসিঞ্চন করে সকলেই যেন সঞ্জীবিত করে রাখতে চায় একটি আশাতরু। সম্রাট ফিরে আসুন বিজয়ীর সম্মান নিয়ে—এই সকলের একমাত্র প্রার্থনা।

নাগরিক জীবনের সর্বত্রও যেন এক অলস-মন্থরতা. একাকিনী গৃহবধূর বক্ষ পঞ্জর বিদীর্ণ করে ঝরে পড়ে, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। বিরহী প্রাণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের কতনা ছবি আঁকে! শঙ্কাতুরা জননী-হৃদয় সন্তানের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মাতৃহৃদয় উন্মথিত হয়ে ওঠে বারবার।

কিন্তু বিচ্ছেদের দিন যতই দীর্ঘ হোক কালের বিধানে সমাপ্তি তার আছেই। সমাপ্তি আছে সকল রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষারও।

সেই প্রতীক্ষারই সমাপ্তি ঘোষণা করে দূতের মুখে বিজয় সংবাদ পৌছায় রাজধানীতে। দীর্ঘ-প্রতীক্ষা-রত মানুষগুলির শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে সুখানুভূতির হিল্লোল বয়ে যায়।

জয়ী হয়েছেন সুলতান। অবাধ্য লখনৌতি দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছে। আরো আছে শুভ সংবাদ। দিল্লী

প্রত্যাবর্তনের পথে ত্রিহুটও জয় করেছেন গিয়াসুদ্দিন। সন্ধি হয়েছে ত্রিহুটের রাজা হরসিংদেবের সঙ্গে। বিজয়ী বাহিনী দীর্ঘপথ অতিক্রম করে দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে।
পরবর্তী দিনগুলো কেটে যেতে থাকে আনন্দ শিহরিত কয়েকটা মুহূর্তের মতো। চতুর্দিকে সুলতানকে বিজয়-অভিনন্দন জানাবার পূর্ব-প্রস্তুতি। খুশীর জোয়ার এসে যেন আছড়ে পড়তে থাকে হৃদয়ের তটে।
রাজধানীর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি নারী, প্রতিটি শিশু তাদের চোখে উৎসাহের আলো জ্বেলে অপেক্ষা করে রইল আগামীর জন্য, বিনিদ্র কেটে গেল কয়েকটি রাত্রি।
তারপর পক্ষকাল শেষে এক বিশেষ দিনের অপরাহ্নে সূর্য যখন সারা আকাশে তার রক্ত-রঙ ছড়িয়ে দিয়ে বিদায়োন্মুখ—সেই সময় তোরণে প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠল দামামা।
যারা সক্ষম মুহূর্ত বিলম্ব না করে তারা পথে বেরিয়ে পড়ল। নারীরা বাতায়ন পথে ব্যায়ত চোখে চেয়ে রইল সৈন্য স্রোতের আগমন প্রত্যাশায়; ক্রমে ক্রমে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মতো অগণিত সৈন্য রাজপথ দিয়ে প্রবেশ করল নগরীর অভ্যন্তরে। চতুর্দ্দিকে ফেটে পড়ল মুখর জয়ধ্বনি।
বাহিনীর অগ্রভাগে হস্তীপৃষ্ঠে সোনার সুতোর কারুকার্য খচিত হাওদার উপরে দৃষ্টিগোচর হল বিজয়ী সুলতানের সুদৃঢ় মুখমণ্ডলে প্রত্যয় এবং আত্মতুষ্টির হাসি। দেহের লৌহজালিকের উপর থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল সূর্যের শেষ রক্তিম রশ্মি। নাগরিকদের সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল সেদিকে।
যুদ্ধ প্রত্যাগত বিজয়ী সম্রাটের ঠিক পাশে আর এক যোদ্ধার বিশাল সুগঠিত দেহ এবং বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডলও সেদিন দর্শকদের

মনে সমান কৌতূহল ও প্রশংসার উদ্রেক করেছিল। তাঁর বৃষস্কন্ধ, আজানুবাহু, তাঁর মুখের মৃদু হাসি, অশ্বচালনার সাবলীল ভঙ্গিমা সকলের মনের গভীরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে দিল মুহূর্তে। সকলের মনে এই প্রশ্ন উচ্চকিত হয়ে রইল কে এই অশ্বারোহী?
সুলতান গিয়াসুদ্দিনের বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এইভাবেই একদিন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন ইন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথ। ভাগ্য-চক্রের অদ্ভুত আবর্তন লক্ষ্য করতে করতে সেদিন সবার অলক্ষ্যে সম্ভবতঃ তার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল।
দিল্লীর চতুর্দিকে তখন অতুলন ঐশ্বর্যের দীপ্তি; চূড়ান্ত বিলাস ব্যসনের স্রোত প্রবাহিত। মহেন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন সব। অন্যদিকে, রাজদরবারের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উন্মুখ জিজ্ঞাসা নিয়ে মহেন্দ্রনাথের পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল সকলের কাছে; সুলতানই স্বয়ং দরবারে আনুপূর্বিক ঘটনাবলী বিবৃত করেছিলেন।
লখনৌতি অভিযান সমাপ্ত হবার পর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সুলতান চাইলেন তিরহুটকেও সাম্রাজ্যভুক্ত করবেন। একযাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? তাছাড়া অনেকদিন ধরেই তিরহুটের সম্বন্ধে সুলতানের মনে অসন্তুষ্টির বিষবাষ্প জমা হয়েই ছিল কারণ এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির শাসনকর্তা হরসিংদেব কোনদিনই দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন নি। সুতরাং সুযোগ যখন এসেছেই তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইলেন গিয়াসুদ্দিন। তার আদেশে সৈন্যবাহিনী অবরোধ করল তিরহুট রাজ্য।

বাধ্য হয়েই হরসিংদেব যুদ্ধ করলেন ; একটা খণ্ডযুদ্ধমাত্র। তাতেই মীমাংসা হয়ে গেল জয়-পরাজয়। বস্তুত দিল্লীর প্রসারিত হস্তের সীমানার বাইরে অবস্থান করে এতকাল হরসিংদেব নিশ্চিন্ত বিলাসেই সময় কাটিয়েছেন; যুদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন তিনি কখনোই উপলব্ধি করেন নি। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সুলতানের রণদক্ষ বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তার অপটু সেনাদল যে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হল তা অত্যন্ত ক্ষণিক; শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন হরসিংদেব।

দূরদর্শী গিয়াসুদ্দিন মেনে নিলেন সন্ধি প্রস্তাব। রাজধানী দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে তার সৈন্যদল; যুদ্ধ এবং সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমনে তারা এখন ক্লান্ত। সুতরাং যত শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করা যায় ততই মঙ্গল। উপরন্তু সন্ধি-প্রস্তাব মেনে না নিলে শত্রুতারও অবসান ঘটবে না। যে কোন ক্ষণে অলক্ষিত-আক্রমণ নেমে আসতে পারে ক্লান্ত সৈনিকদের উপর। তার ফল নিশ্চয়ই শুভ হবে না,' তাতে নতুনভাবে শক্তি-ক্ষয়েরই পূর্ণ সম্ভাবনা।

ফলে সন্ধি হল দুপক্ষে। হরসিংদেবও দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন ত্রিহুট এল দিল্লীর ছত্রচ্ছায়ায়।

ভাগ্য চিরদিনই খেলেছে মহেন্দ্রনাথকে নিয়ে। কিন্তু তার জন্য কোনদিনই বেদনাবোধ করেননি মহেন্দ্রনাথ। বরং সকৌতুক বিস্ময়ে সেই খেলা উপভোগ করেছেন তিনি। আবারও ভাগ্য খেলা করল তাকে নিয়ে। না হলে সুলতানের কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে যাবেন কেন? না হলে তার বীরত্ব ও রণদক্ষতা গিয়াসুদ্দিনের চোখে মোহাঞ্জন এঁকে দেবে কেন?

তিরহুটের প্রতিরোধের যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধের মর্যাদা না দিয়ে যদিও তার ছায়া বলাই সঙ্গত তবুও মহেন্দ্রনাথ কিন্তু আপ্রাণ লড়াই দিতে কসুর করেন নি। যুদ্ধের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যূহরচনা করেছেন প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য; মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মত্ত হস্তীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। এই একটি মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাই গিয়াসুদ্দিনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর অমিত প্রাণশক্তি সুলতানকে বিস্মিত করেছিল।

অনেক যুদ্ধের নায়ক তিনি, অপর এক সেনানায়কের সিংহবিক্রম তাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রতিভা চিনে নিতে তার ভুল হয়নি। মনে মনে স্বীকার করেছিলেন, মহেন্দ্রনাথের তুল্য সৈনিক নিজের যুদ্ধ-আকীর্ণ জীবনেও তিনি খুব বেশী দেখেন নি।

অতএব মহেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে আহ্বান এল সুলতানের পক্ষ থেকে। সুলতানই সযত্নে দিল্লীর অতুলন ঐশ্বর্য্যের মোহাঞ্জন এঁকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন তাকে।

মহেন্দ্রনাথ আজীবন সৈনিক; রক্তে তাঁর চলার ছন্দ। সুতরাং আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন না। হরসিংদেবের অনুমতি নিয়ে নতুন করে আর একবার চলা শুরু করলেন অজানিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে। দিল্লী আগমনের পথে কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগের দুঃসহ আঘাত তাকে সহ্য করতে হল। পথিমধ্যে ভেদবমনে আক্রান্ত হয়ে মহেন্দ্রনাথের জীবনসঙ্গিনী তাকে ছেড়ে গেলেন। বক্ষপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। একবার মাত্র ধূসর-অতীতের দিকে ফিরে তাকালেন। তারপর একমাত্র পুত্রসন্তান ইন্দ্রনাথের মুখ চেয়ে সমস্ত শোককে নীলকণ্ঠের মতো গলাধঃকরণ করে ফেললেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হবার পর যুদ্ধবিজয়ী বীরের অভ্যর্থনাই

মিলেছিল মহেন্দ্রনাথের ভাগ্যে। যেন তিনিই জয় করে এসেছেন যুদ্ধ। সুলতানের দরবারেও সকলেই তাকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। সুলতানও তাঁকে দান করেছিলেন অযাচিত মর্যাদা। দোয়াবের দক্ষিণখণ্ডে এক বিশাল জায়গীর দান করে তাকে সম্মানিত করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ তার নতুন নামকরণ করেছিলেন ধাত্রীগড়।

আশ্চর্য ভবিতব্য! কোথায় সেই তিরহুট আর কোথায় দোয়াব? দোয়াবের দুঃখী রায়ত-প্রজারা মহেন্দ্রনাথকে পেয়ে যেন মাথার উপর একটা আচ্ছাদন পেয়েছিল। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ তো দিল্লীতেই থাকতে পারতেন। তিনি দোয়াবে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন কেন? তার উত্তরও দোয়াববাসীর অজানা নয়।

প্রকৃত অর্থেই মহেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরুষসিংহ—তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল অমোঘ। ক্রমে ক্রমেই সেই ব্যক্তিত্ব সুলতান গিয়াসুদ্দিনকে চূড়ান্তভাবেই প্রভাবিত করে ফেলতে লাগল। তিনি বড় বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগলেন মহেন্দ্রনাথের উপর।

এর পশ্চাতে আর একটা কারণও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সম্ভবতঃ। গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসেছিলেন প্রায় প্রৌঢ় বয়সে। সুদীর্ঘ জীবন সংগ্রামের পর যে অধিকার তার করায়ত্ত হয়েছিল তাকে হারাবার ভয়ও ছিল পদে পদেই। সুলতান তাই তার পার্ষদদের মধ্যে কাউকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বলে মনে করতে পারতেন না। লখনৌতি অভিযান সঙ্গে করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবার পর এই দ্বন্দ্ব তার মনের মধ্যে আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

মহেন্দ্রনাথকে গিয়াসুদ্দিন আবিষ্কার করলেন ঠিক সেই দুঃসহ

মানসিক অবস্থার মধ্যে। দেখেই তার মনে হল এই সেই মানুষ যার উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায়; যাকে হৃদয়ের সাথী করা যায়। মহেন্দ্রনাথ তাই চোখের মণি হয়ে উঠলেন সুলতানের।

কিন্তু সুলতানের দরবারে মহেন্দ্রনাথের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি অভিজাতদের অনেককেই চিন্তিত করে তুলল। একজন সাধারণ হিন্দু-ভূস্বামীর এই কর্তৃত্ব তাদের হৃদয়ে ঈর্ষার দাবানল জ্বালিয়ে দিল। শুরু হল মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সুলতানের মনে মহেন্দ্রনাথের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করবার জন্য শুরু হল নানা প্রচেষ্টা। যারা প্রথমে মহেন্দ্রনাথকে পরমবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন তারাই হয়ে উঠলেন তার পরম শত্রু।

মহেন্দ্রনাথ যে শুধু বীরপুরুষ ছিলেন তাই নয়, ছিলেন যথেষ্ট তীক্ষ্ণধীও। তাই তিনি তার বিরুদ্ধে ছড়ানো চক্রান্তের জালে ধরা দিলেন না। নিঃশব্দে সমস্ত কর্ম মুখরতার মাঝখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। দোয়াবের মাটিতে নিজের জায়গীরে বসবাস করবার অনুমতি প্রার্থনা করে নিলেন সুলতানের কাছ থেকে। সময় কেটে যেতে লাগল তারপর।

কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধার জীবনে বিশ্রামের অবসর কোথায়? সে জীবনে শুধুই সংগ্রাম। যুদ্ধই যোদ্ধার জীবন। সেই যুদ্ধের ডাকেই আবার সাড়া দিতে হল মহেন্দ্রনাথকে।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিক। সহসা সমগ্র সাম্রাজ্যের মাথার উপর ঘনিয়ে এল চূড়ান্ত বিপদের কালো একখানা মেঘ। সমগ্র সীমান্ত জুড়ে দেখা দিল ভয়ানক ত্রাস। রাজধানীতে দূতের মুখে খবর এসে পৌঁছল অসংখ্য মোঙ্গল দস্যু সীমান্ত আক্রমণ করেছে।

মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পঙ্গপালের মতো নেমে আসছে

দস্যুরা। সংখ্যায় তারা অগণিত। এদের কোটরাগত গোলাকার চোখে হিংসার করাল ছায়া; ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী দেহে সিংহের বিক্রম। অন্তরে দয়ামায়ার লেশমাত্রও নেই।
সীমান্ত বরাবর গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করে দিচ্ছে এরা, প্রচণ্ড প্রয়াসে সমস্ত বাধাকে অপসারিত করে সাম্রাজ্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টায় ওরা দুর্দান্ত হয়ে উঠছে ক্রমশই। যে কোন সময়েই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিরোধের প্রাচীরকে চূর্ণ করে দেবে ওরা।
ভয়ংকর দুঃসংবাদ। ইতিকর্তব্য স্থির করবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। গিয়াসুদ্দিনের প্রশস্ত ললাটে দুশ্চিন্তার অজস্র বলিরেখা ফুটে উঠল। এমনিতে স্থির বুদ্ধির মানুষ তিনি। হিসাবে তাঁর কখনও ভুল হয় না। এখন কিন্তু কুটিল চিন্তার জালে বারবার পথ হারিয়ে ফেলতে লাগলেন।
এই ঘোর দুর্দিনে কার উপর আস্থা রাখতে পারেন? চার পাশে অনেক বীর যোদ্ধাই আছেন। কূটকৌশলী সেনা নায়কেরও অভাব নেই দরবারে। কিন্তু সত্যিকারের সুহৃদ্ তার চারদিকে কজন—সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ তার মনে। যাকে প্রতিরোধের ভার অর্পণ করে পাঠাবেন সে-ই যে শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না—তার নিশ্চয়তা কি!
তিনিই স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলার জন্য, কিন্তু রাজধানী তাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। মোঙ্গল দস্যুদের প্রকৃতি তিনি চেনেন, সীমান্তের বিভিন্ন স্থানেই তারা আঘাত করে করে দেখবে। যে স্থান তাদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে হবে সেখান দিয়েই তারা বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঢুকে পড়বে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে। সুতরাং এই সময়ে কোন এক

বিশেষ রণাঙ্গণে সুলতানের পক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং একজন অতি-বিশ্বস্ত, দুঃসাহসী, কূটকৌশলী সেনানায়ক চাই এবং এই মুহূর্তেই যে নিজের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখবে না। কিন্তু কোথায় এমন মানুষ?

দুশ্চিন্তার তীক্ষ্ণধার ফলাগুলো সুলতানকে ক্ষত বিক্ষত করে। অস্থির পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ান সুলতান। মনস্থির করতে পারেন না কিছুতেই। অথচ বিলম্ব করবার এতটুকু সময় নেই। দিনে দিনে শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে শত্রুদলের। দিনে-দিনেই ক্ষতির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন সময় সীমান্তরক্ষীবাহিনীর সাময়িক বাধাকে ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে অগণিত দস্যু নেমে আসবে সাম্রাজ্যের গভীরে। তখন ওদের গতি হবে দুর্বার— শিকারকে নিঃশেষে উদরস্থ করবার উদগ্র আগ্রহে ওরা হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। সবই বোঝেন সুলতান, কিন্তু পথ খুঁজে পাননা। ঠিক অনুরূপ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে সহসা গিয়াসুদ্দিনের মনের দর্পণে ঝলসে ওঠে এক দৃঢ় মুখচ্ছবি; মহেন্দ্রনাথের।

অন্ধকারের মধ্যে সুলতান যেন সহসা পথের দিশা খুঁজে পান। আশ্চর্য! এই ঘোর দুর্দিনে এই মানুষটির কথা মনে পড়তে তার এত বিলম্ব হল কেন? না, আর কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। এই দুরূহ কর্তব্যের ভার যে একটিমাত্র ব্যক্তির উপর অর্পন করা যায় তিনি মহেন্দ্রনাথ। সুলতানের অস্থির মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। মনস্থির করে ফেলেন।

যথাসময়ে মহেন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌঁছয় সুলতানের গোপন পত্র। গিয়াসুদ্দিন বিশেষ কারণে মহেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠিয়েছেন; কালবিলম্ব না করে যেন তিনি রাজধানীতে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পত্রের সামান্য কটি ছত্রের মধ্যেও গভীর

উৎকণ্ঠার গোপন ভাষা নির্ভুলভাবে পাঠ করেন মহেন্দ্রনাথ। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নি সুলতানের সঙ্গে—দরবারেও অনুপস্থিত আছেন অনেক কাল। সুতরাং এই সুযোগ ত্যাগ করা উচিত হবে না, তাই পত্রপাঠ রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে।

সুলতান যেন মহেন্দ্রনাথের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সসম্মান অভ্যর্থনা জানালেন প্রিয় সুহৃদকে। তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু দরবারকক্ষে কোন বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত করলেন না, সাধারণ কথাবার্তাই কিছুক্ষণ বিনিময় হল।

অতঃপর সেদিনের মতো দরবারের কাজ সমাপ্ত করে সুলতান মহেন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রবেশ করলেন গোপন মন্ত্রনাগৃহে। সীমান্তে মোঙ্গলদস্যুদের অতর্কিত আক্রমণ, তাদের অত্যাচার, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বাধাকে অপসারণ করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের প্রবেশেচ্ছা—সমস্ত ঘটনাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহেন্দ্রনাথের কাছে বর্ণনা করলেন সুলতান। শেষ পর্যন্ত অকপটে তার মনোগত বাসনার কথাও ব্যক্ত করলেন। বিশসহস্র সুদক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী তিনি সীমান্তে প্রেরণ করতে ইচ্ছুক এবং এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব দান করতে চান মহেন্দ্রনাথের উপরই, অবশ্য মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং যদি এই গুরুদায়িত্ব বহনে স্বীকৃত থাকেন।

ক্ষণকালের জন্য নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মহেন্দ্রনাথ। সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই অজস্র চিন্তা তার মনে ভীড় করে এল। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকেও যেন একবার সামনে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন।

যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয় তবে তার একমাত্র সন্তান ইন্দ্র অসহায় বোধ করবে নিজেকে। নিজের বুক দিয়ে যে আড়াল গড়ে রেখেছেন তার চারদিকে তা' ভেঙে পড়বে। কিন্তু সে তো একদিন

হবেই; আজ হোক, কাল হোক। মানুষতো অমর নয়; মৃত্যু তো ইচ্ছাধীন নয়। তাছাড়া ইন্দ্র এখন যথেষ্ট বড়ও হয়েছে। সুতরাং তাকে ঘিরে পিতৃহৃদয়ের কেন এই অকারণ শঙ্কাবোধ?

নিজেকে নানাভাবে বোঝাতে চাইলেন মহেন্দ্রনাথ। তাছাড়া এতকথা চিন্তা করার সময় কোথায় যোদ্ধার জীবনে? থাকা উচিত নয়। প্রতিপদে বিপদ আর অনিশ্চয়তা আছে বলেই না যুদ্ধ এত মোহময়! মহেন্দ্রনাথ না যোদ্ধা? যুদ্ধের হাতছানি দেখছেন তিনি। এখন আর পিছনে তাকাবার সময় নেই। সাড়া তাকে দিতেই হবে।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্রনাথ মুখ তুলে যখন সুলতানের প্রতীক্ষা-উন্মুখ চোখের উপর তার দৃষ্টি মেলে ধরলেন তখন সুলতান পর্যন্ত চমকে উঠলেন। এই সেই প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর যোদ্ধার মুখ, চিনে নিতে তিলেক বিলম্ব হলনা সুলতানের। কঠোর প্রতিজ্ঞার অগনি-দীপ্তি থমকে রয়েছে মহেন্দ্রনাথের উন্নত কপালে, বিশাল চোখের ঘন কালো দুই তারায়।

সুলতানের প্রস্তাবে সানন্দ-স্বীকৃতি জানালেন মহেন্দ্রনাথ, সঙ্গে হৃদয়ের অশেষ কৃতজ্ঞতাও। এক ক্ষুদ্র ভূস্বামী তিনি; সুলতানের অযাচিত দাক্ষিণ্যে অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের গৌরবময় শীর্ষে আরোহণ করবার সুযোগ পাচ্ছেন। সুতরাং সুলতানের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মহেন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসুদ্দিন এক জরুরী পরোয়ানা জারী করে তাকে বিশ-হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করলেন। বিশহাজার সুনিপুণ যোদ্ধার সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে অগ্রসর হলেন সীমান্তের উদ্দেশ্যে। নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষায় তৎপর থাকবেন এই শপথবাক্য উচ্চারণ

করে গেলেন সুলতানের কাছে। সুলতানের মনেও অবশ্য সে বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না।

সমগ্র সীমান্ত জুড়ে তখন ত্রাসের রাজত্ব। চারদিকে হাহাকার। চারদিকে ব্যাপক ধ্বংসের ক্ষতচিহ্ন। তার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ অতি সজাগ প্রহরীর মত শত্রুর মোকাবিলার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। তার মনোগত বাসনা, প্রথমেই হানবেন প্রচণ্ড আঘাত প্রথম আঘাতেই চূর্ণ করে দেবেন শত্রুপক্ষের মেরুদণ্ড।

করলেনও তাই; অতর্কিতে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের উপর। তুমুল যুদ্ধ হল দুপক্ষে। মহেন্দ্রনাথের সুযোগ্য নেতৃত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে লড়াই করল সুলতানী সৈন্য। মোঙ্গল দস্যুরা করল প্রাণরক্ষার লড়াই। অবশেষে জয়ী হলেন মহেন্দ্রনাথ। মোঙ্গলেরা পরাজয় বরণ করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

এই যুদ্ধে মহেন্দ্রনাথ মত্ত হস্তীর বিক্রমে লড়াই দিয়েছিলেন, উপহার পেয়েছিলেন দেহের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি সুগভীর ক্ষত। তারমধ্যেই একটি ক্ষত হঠাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠল। সেই বিষাক্ত ক্ষতই মৃত্যু ডেকে আনল তার।

রাজধানী দিল্লীতে একই সঙ্গে দূতের মুখে বিজয় সংবাদ এবং মহেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর খবর পৌঁছল। এতবড় বিজয় সংবাদ সুলতানের মুখে এককনা হাসিও ফোটাতে পারল না, তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেন। মহেন্দ্রনাথের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় সুলতানের মাথা আপনি নত হয়ে এল।

সেই পিতার পুত্র ইন্দ্রনাথ; শেরের বাচ্চা শের। সংগ্রামের নেশা তারও রক্তের প্রতি কণিকায়! তাই অন্যায় আর শোষনের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ গর্জন করে উঠতে চায়। ন্যায়বিচারের নামে

মিথ্যার প্রহসন তার মনের গভীরে চিরদিনই অন্ধ-আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। তাই দোয়াবের রায়ত-প্রজাদের উপর করবৃদ্ধির আদেশ নামা জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রোধের আগুন যেন লেলিহান শিখায় জ্বলে ওঠে। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য দোয়াবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘূর্ণিবায়ুর মতো ছুটে বেড়ায় ইন্দ্রনাথ। দুঃসাহসিক সংকল্প গ্রহণ করতে বুক কাঁপে না তার।

আসলে, একবার কোন কাজে অগ্রসর হবার পর পিছিয়ে আসা ইন্দ্রনাথের চরিত্রে নেই। সে জানে, এই নিরীহ মানুষদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করানো কঠিন; কারণ, এরা সবকিছুকেই দৈবের অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত। তবুও সব জেনেবুঝেই সে কাজে নেমেছে। ইন্দ্র বিশ্বাস করে, এই অবহেলিত সবহারানো মানুষগুলোই একদিন প্রতিবাদে মুখর হবে। প্রতি-রোধের দুর্জয় শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে।

প্রতিটি মানুষের কণ্ঠ যদি একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে সেই শব্দ শোনাবে বজ্রপতনের শব্দের মতো ভয়ংকর। দিল্লীর সিংহাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে উঠবে তখন।

সুতরাং কাজে নেমে পিছিয়ে আসা চলবে না, কঠোর প্রতিজ্ঞা ইন্দ্রনাথের।

মণিরত্ন-খচিত সিংহাসনে বসে সাধারণ প্রজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ নিয়ে সুলতানদের খেয়ালের খেলা চিরতরে বন্ধ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইন্দ্রনাথ। এ এক চরম বিদ্রোহেরই মনোভাব তার, সুলতানের অমোঘ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক অন্ধ-আক্রোশ।

ইন্দ্রনাথের মতে রাজত্ব করার অর্থ প্রজাপীড়ন নয়, প্রজানুরঞ্জন। রাজা হবেন প্রজাপালক; সমস্ত প্রজার পিতার স্থান নেবেন তিনি।

প্রজাদের মঙ্গলবিধানে প্রয়োজন হলে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে তাকে, কল্পস্বর্গে বসে উদ্ভট কল্পনার জাল বয়ন করলে চলবে না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাই করে চলেছেন সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক। সাম্রাজ্য শাসনের নামে চালাচ্ছেন উদ্ভট খেয়ালখুশীর লীলাখেলা; যার অপর নাম স্বৈরাচার। তার বলি অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

স্বৈরাচার না বলে একে আর অন্য কোন্ নামেই বা অভিহিত করা যায়—ভাবে ইন্দ্রনাথ। প্রজাদের ব্যথা বেদনার সঙ্গে শাসকের সম্পর্ক নেই অথচ সেই শাসকই তার পাশাখেলায় ছক্কা-পাঞ্জা হিসাবে ব্যবহার করে চলেছেন প্রজাদের। আবার এ যে শুধু বর্তমান সুলতানের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, সুলতানী শাসনতন্ত্রের মূল ধারাই এই।

ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসুদ্দিনও কি তার পিতা মহেন্দ্রনাথকে এমনই পাশার দান হিসাবে ব্যবহার করেন নি? ইন্দ্রনাথ স্থিরনিশ্চয় যে তাই তিনি করেছিলেন। অগণিত দুর্ধর্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে সৈন্যপরিচালনার দুরূহ দায়িত্ব অর্পণ করে মহেন্দ্রনাথকে তিনি সীমান্তে প্রেরণ করেছিলেন। এর অর্থ কি অবধারিত মৃত্যুর মধ্যে একজনকে ঠেলে দেওয়া নয়? তার পিতা আজীবন সংগ্রামী, তিনি অবশ্যই সেই দায়িত্বভার স্কন্ধে তুলে নিতে অস্বীকার করেন নি। যুদ্ধ করেছেন অসীম বীরত্বে—জয়লক্ষ্মীকে ছিনিয়ে এনেছেন নিজের প্রাণের বিনিময়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা হীন চক্রান্তের মনোভাব কি এর মধ্যে খুবই দুর্লক্ষ্য?

প্রশ্নগুলো ইন্দ্রনাথকে বার বার উন্মনা করে দেয়।

অন্য কোন সমরনায়ক কি সুলতানের পাশে কেউ ছিলেন না যার পরে গিয়াসুদ্দিন অর্পণ করতে পারতেন এই গুরুদায়িত্ব?

পারলেও তা তিনি করতে চান নি। প্রকৃতপক্ষে, কাঁটা দিয়েই তিনি কাঁটা তুলতে চেয়েছিলেন।

ইন্দ্রনাথ এইভাবেই বিশ্লেষণ করে ঘটনাকে। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত উত্তেজনায় ক্রোধে তার শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে উন্মাদগতিতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়।

তার পিতার মৃত্যুর জন্য যে শক্তি দায়ী এবং দায়ী দোয়াবের এই অসংখ্য রায়ত-প্রজার দুর্দশার জন্য সেই মূলশক্তির বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করার শপথ বাক্য উচ্চারণ করে ইন্দ্র। প্রজাদের ন্যায়-সংগত অধিকারের সম্মুখে যে বাধার পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে অপসারিত করতে হবে, ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে।

কিন্তু সে তো একক শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ইন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করে। তার উদ্দেশ্যকে সফলকাম করার জন্য প্রয়োজন নবশক্তির উদ্বোধন যে শক্তি লুকিয়ে আছে জনগণের মধ্যে। সহস্র সহস্র মানুষকে তাই নবমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে হবে। ওদের মধ্যে স্বাধিকার বোধকে জাগ্রত করে দিতে হবে।

ইন্দ্রনাথ জানে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যাচার আর নিপীড়নের উলঙ্গ রূপ প্রকট হয়ে উঠবে দিকে দিকে। অগ্নিদগ্ধ হবে অসংখ্য গৃহ, নারীরা হবে নির্যাতিত ; প্রজাদের শেষ সম্বলটুকুও পাশবিক জিঘাংসায় কেড়ে নিয়ে যাবে করসংগ্রাহকেরা। শোষণের তীক্ষ্ণধার খড়্গ নির্বিচারে নেমে আসবে প্রজাদের মাথার উপর।

সেই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করে আছে ইন্দ্রনাথ। সে তার সচেতনতা দিয়ে বেশ উপলব্ধি করতে পারছে যে, যতদিন না এরা চূড়ান্ত আঘাত পাচ্ছে ততদিন এরা সঙ্ঘবদ্ধ হবে না। কিন্তু এরা যতই নিরীহ হোক—অদূর ভবিষ্যতে বীভৎস অত্যাচারের নগ্ন দৃশ্য এদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। ধীরে ধীরে মনের

গভীরে আগুন জ্বলে উঠবেই। ঠিক সেই লগ্নে ইন্ধন যোগাতে হবে অগ্নিতে।

দোয়াবের আপামর জনসাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে নারকীয় অত্যাচারের নিখুঁত দৃশ্যাবলী। সকলের মনের অতলে এই বিশ্বাসের বীজ বুনে দিতে হবে যে অত্যাচারীর সামনে নতজানু হয়ে বসে অত্যাচারকে নির্বিচারে মাথা পেতে নিলে অত্যাচারীর হাত কখনও নীরব হয় না—সে হাতকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার একমাত্র পথ হল আঘাতের সমান প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দেওয়া।

ওদের বোঝাতে হবে, অধিকার কেউ কাউকে দান করে না। অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে হয়। শাসক সবসময়ই চায় নিজের জন্য সমস্ত অধিকারকে সংরক্ষণ করে রাখতে। যতই এই কাজে সে সক্ষম হবে ততই তার শাসন সুদৃঢ় হবে। সুতরাং তা যাতে না হয় তার জন্য লড়াই করো; আমৃত্যু সংগ্রাম দাও। সংগ্রামই একমাত্র বাঁচার পথ।

অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে দোয়াবের রায়ত প্রজাদের দিয়েই বিদ্রোহ করাতে হবে। সে দেবে নেতৃত্ব; জীবন বাজী রাখবে তার জন্য। নতুন ইতিহাস তৈরী হোক্ দোয়াবের মাটিতে।

(পাঁচ)

দোয়াবের পশ্চিম বরাবর যে প্রশস্ত রাজপথ সিধা উত্তর-দক্ষিণে যমুনানদীর সমান্তরালে প্রসারিত হয়ে গেছে সেই পথ ধরে উত্তরে কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হবার পর দেখা যায় পথটি ত্রিমার্গী আকার ধারণ করেছে। এই ত্রিমার্গী সংযোগস্থল থেকে যে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রশস্ত পথটি ঈষৎ পূর্বগামী সেই পথ ধরে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে দৃষ্টিগোচর হয় পাশাপাশি কয়েকটি হিন্দু প্রজাবহুল জনপদ। প্রতিটি জনপদই একসময় ছিল অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু। কিন্তু সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রতিটি জনপদের সন্তোষশ্রীকেই হরণ করে নিয়েছে।

এই জনপদগুলির মধ্যে বিল্বগ্রাম অন্যতম। বিল্বগ্রামই সম্ভবতঃ প্রথম জনপদ যার উপর করসংগ্রাহকদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাই চতুর্দ্দিকে অজস্র অত্যাচারের ক্ষতচিহ্নগুলি বুকে নিয়ে বিল্বগ্রাম শ্মশানের স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গৃহগুলির অধিকাংশই অর্ধদগ্ধ, কোন কোনটি একেবারে ভস্মীভূত। কিছু কিছু গৃহপালিত কুকুরকে খাদ্যের অন্বেষণে ইতঃস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, কিন্তু কোনখানে একটি মানুষের কণ্ঠও শোনা যায় না। বিল্বগ্রামের মানুষ আজ অরণ্যে বাস নিয়েছে। তারা ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে পলাতক।

অপমৃত্যু আর নির্যাতনের সংবাদ মুখে মুখে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিতেও

ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয় নি। সেই সংবাদ সর্বত্রই হিমশীতল মৃত্যুর স্তব্ধতা এনে দিয়েছে। প্রতিটি জনপদেই একটিমাত্র উদগ্র প্রশ্ন উদ্যত হয়ে আছে ; পরবর্তী বলি হবে কোন্ স্থান ?

সবই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ইন্দ্রনাথ। বিল্বগ্রামের ধ্বংস-চিহ্নগুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুতীব্র ব্যথার অনুভূতি তাকে যেন অভিভূত করে ফেলে ; ভাবে. তার ভবিষ্যৎপ্রত্যক্ষণ কি অভ্রান্ত ! যা সে আশঙ্কা করেছিল অনিবার্য ভাবেই তা শুরু হয়েছে। এবার বীভৎস অত্যাচারের নব-নব দৃষ্টান্ত তৈরী হবে দিকে দিকে। কিন্তু বীজ বপন করবার সময়ও এটাই—প্রতিরোধের বীজ। ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত তখন দেরী করবে কেন ইন্দ্রনাথ ? ভবিষ্যতে কি হবে ভবিষ্যৎ তার সাক্ষী ; বর্তমানকে অবহেলা করবে না সে। শুধুমাত্র ইন্ধন দিলেই যেখানে অগ্নি-সম্ভাবনা সেখানে সেটুকু ইন্ধন যোগাতে তার কার্পণ্য থাকবে কেন ?

সেই দুঃসাহসিক অভিপ্রায়েই ইন্দ্র অতিক্রম করে চলে গ্রামের পর গ্রাম। পেরিয়ে যায় বিল্বগ্রাম, কুশীপুর, বরণ, সুলতানপুর। শেষপর্যন্ত তার অশ্ব এসে থাকে শাহারাণপুরের প্রান্ত ঘেঁষে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য অবস্থান থেকে পাঁচজন মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়ায় চারদিকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটিকে উদ্দেশ্য করে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করে ; পীতম্ আগামীকালের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ. আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত।

সসম্ভ্রমে উত্তর দেয় বক্তা।

—খবর সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ, দশখানা জনপদের সমস্ত তরুণ এবং সমর্থ মানুষই খবর পেয়েছে। আশা করা যায় কয়েকসহস্র মানুষ সমবেত হবে।

ইন্দ্রনাথের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো মানুষকে একত্র সমবেত করা সম্ভব হবে এ তার কল্পনারও অতীত।

পীতম এবং তার অনুচরদের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বলে ওঠে; পীতম্, এ অসম্ভব যদি সম্ভব হয় তবে একমাত্র তোমাদের চেষ্টার ফলেই তা সম্ভব হল বলে আমি মনে করবো। তোমাদেব প্রত্যেকের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকেই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উত্তর দিতে গিয়ে পীতম্ অভিভূত হয়ে পড়ে। শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে সে বলে ওঠে; আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই মালিক, আপনার নামেই মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। আমরা শুধু গোপানে সকলেব কাছে খবর পৌছে দিয়েছি। সবাই ওৎসুক; সবাই আপনাকে দেখতে চায়, আপনার কথা শুনতে চায়।

পীতমের কথা শুনতে শুনতে ক আশ্চর্য অনুভূতি ইন্দ্রের বুকের মধ্যে গুঞ্জরণ তোলে। কি সুখকর এই সংবাদ! সবাই তাকে দেখতে চায়, তার কথা শুনতে চায়। তবে কেন না পাববে সে? জনগণের শক্তিই তো সেই মূল শক্তি যা যে-কোন অচলায়তনের বাধাকেই নির্মূল করে দিতে পারে। একবার যদি সেই গণদেবতার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তখন আর কোন বাধাই বাধা থাকবে না। আপন প্রাণশক্তির দুরন্ত বেগে নিজের পথ সে নিজেই তৈবী করে নেবে।

ক্ষণিক স্তব্ধতার পর ইন্দ্রনাথ আবার সরব হয়, প্রশ্ন করে, সময় স্থির করেছ?

—হ্যাঁ. রাত্রির দ্বিতীয় যাম।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে পীতমের পক্ষ থেকে।

—স্থান?

ইন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রশ্ন।

—কুশীপুরের উত্তর-পশ্চিমে জনপদ থেকে আধক্রোশ দূরে প্রাচীন আমলের একটা ভাঙা গড় আছে। লোকে বলে, রাজা রুদ্রদেবের গড়। তার একদিকে প্রাচীর ভেঙে গেলেও অন্যদিকের প্রাচীর এখনও অটুট। স্থানটি অত্যন্ত নির্জন এবং নিরাপদ। সবদিক ভেবে ওই স্থানটি নির্বাচন করা হয়েছে। এখন আপনার অভিমত ··

কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে যায় পীতম্।

—উপযুক্ত স্থানই নির্বাচন করেছে। হ্যাঁ, আর একটিমাত্র প্রশ্ন, নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা হয়েছে ?

শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু যেন ইতঃস্তত করে পীতম্। তারপর দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলে ; বিশেষ কিছু এখনও করে ওঠা সম্ভব হয় নি। তবুও কমপক্ষে পাঁচশত সুদক্ষ লাঠিয়াল গড়ের চারদিক গোপনে পাহারা দেবে। দরকার হলে তারা প্রাণ পর্যন্ত দেবার জন্য তৈরী।

—চমৎকার ! তোমাদের আমি কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা অসাধ্য সাধন করেছ—এটুকুই শুধু বলতে পারি। ওদের কর্মতৎপরতাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে অভিনন্দন জানায় ইন্দ্র।

তারপর গভীর মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আবার শুরু করে তার যাত্রা। দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করতে হবে তাকে। বিশ্রামের এখন অবসর নেই। শিক্ষিত অশ্ব ইঙ্গিতে পথ চিনে নেয়। ধীরে ধীরে রাত নেমে আসে। আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা দেয় ; বিষন্ন পাণ্ডুর চাঁদের ম্রিয়মান আলোয় সম্মুখের দীর্ঘ প্রসারিত পথ একখণ্ড রূপালি পাতের মতো ঝিক্‌মিক্ করে। চতুর্দ্দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে ইন্দ্রনাথ। কোথায় যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। এমনকি বাতাসও যেন উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে আছে।

দীর্ঘ পর্যটনের পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। প্রশস্ত ললাট থেকে ঝরে পড়ে স্বেদবিন্দু। অশ্বের মুখ থেকেও পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে।

পথের দুধারে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র; অকর্ষিত, রুক্ষ, শ্রীহীন। দূর থেকে দূরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে জনপদগুলি হারিয়ে যায়। ভাষাহীন পথের উপর দিয়ে একমাত্র সজাগ প্রহরীর মতো ইন্দ্রনাথ এগিয়ে চলে।

চিন্তা, বিরামহীন চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যায় ইন্দ্রনাথ। আজ আর তার নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে দোয়াবের অজস্র মানুষের ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্ন নয়। তার ভাগ্যের সঙ্গে সকলের ভাগ্যকে সে আজ অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে নিয়েছে। সুতরাং সকলের জন্য আজ একই পথ। সে পথের শেষ কোথায় ইন্দ্রের জানা নেই।

কিন্তু তবুও সকলকে এই যে একই পথের সাথী করে মৃত্যু-মৃত্যু খেলা এর দায়িত্ব কি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে সে?—নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নিলেই বা উৎকৃষ্টতর কিছু হবার সম্ভাবনা কোথায়? দুর্ভিক্ষ, মহামারী অত্যাচার দিকে দিকে ভীষণ মুখব্যাদান করে অপেক্ষা করে আছে। যে কোন মুহূর্তে তাদের ভয়াল দ্রংষ্টায় সবকিছুকে ছিন্ন ভিন্ন করে আত্মসাৎ করে নেবে।

অতএব ভবিষ্যতে সেই মৃত্যুকেই যদি বরণ করতে হয় তো গৌরবের মৃত্যুই তো শ্রেয়। প্রতিদিনের তিল তিল মৃত্যু নয়—একদিনের অমোঘ মৃত্যু। আর সেই মৃত্যু পথেরই সে সন্ধান দিয়েছে দোয়াবের অসংখ্য মানুষকে। এই ভেবেই প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে নিজেকে সান্ত্বনা দেবে ইন্দ্রনাথ। সুতরাং এই ভাবনা নিয়ে এখন আর অনুতাপ করা বৃথা।

(ছয়)

গৌতমের অনুমান যদি সত্য হয় তবে আজ রাত্রির দ্বিতীয় যামে অনেক মানুষই সমবেত হবে রুদ্রদেবের ভাঙ্গা গড়ে। তার উদ্দেশ্য তাহলে শেষপর্যন্ত পূর্ণ হতে চলেছে—ইন্দ্রনাথ ভাবে। এখন এই মানুষগুলোকে সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলায় দায়িত্ব তারই। যদি তাতে সে সক্ষম হয় তবেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে দিকে দিকে; না হলে সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

হৃদয়ের গভীরে চরম উত্তেজনা অনুভব করে ইন্দ্রনাথ। এতবড় একটা দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়ানোর আগে শেষ শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চায়। ভিতরের চূড়ান্ত মানসিক উদ্বেগ তার প্রশস্ত কপালে অজস্র কুঞ্চনরেখা জাগিয়ে তোলে।

দূর থেকে অপলকে সব লক্ষ্য করে ভীম। শিশুকাল থেকেই সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে ইন্দ্রকে, তাই তার অন্তর্বিপ্লব প্রতিটি অভিঘাতকে চিহ্নিত করতে তার ভুল হয় না। সে বোঝে একটা চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য ইন্দ্র নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে। বুঝেও কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করে না, জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায়।

ইন্দ্রনাথকে সে ভয় করে এই অসম্ভব ঘটনাটা কিভাবে ঘটল বহুবার নিজেকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছে ভীমসর্দার। প্রায় জন্ম-মুহূর্ত থেকে যে শিশুর পরিচর্যার ভার নিয়েছিল সে আর তার স্ত্রী লছমী

এবং বুকের সবটুকু স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে যাকে এত বড় করে তুলল তাকেই কোন্ মুহূর্ত থেকে তারা ভয় করতে শিখল সে উত্তর ভীমের নিজেরও জানা নেই।

ভয় না সম্ভ্রম ? পার্থক্যটা মনের মধ্যে বহুবারই পরিষ্কার করে নিতে চেয়েছে ভীমসর্দার। না, সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে ভয়ই সে করে ইন্দ্রকে। ওর চোখের গভীরে তাকাতে বুকের কোথায় অচেনা একটা শঙ্কা জাগে যেন। কেন যেন মনে হয়, ইন্দ্রের হৃদয়ের অতলে একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি তার সমস্ত আগ্নেয় শক্তি এবং উগ্রতা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে ; যে কোন মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটার অপেক্ষা শুধু।

দেখতে দেখতে ভীমের চোখের সামনে ইন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তনগুলো যত বেশী বেশী করে ঘটে যায় ততই যেন ভীম নিজেকে অসহায় বোধ করতে থাকে। বাইরের দিক থেকে ইন্দ্র যতই শান্ত হয়ে উঠতে থাকে ভীমের উদ্বেগ বেড়ে ওঠে ততই।

একদিন ছিল যেদিন ভীমই যথেচ্ছা চালনা করেছে ইন্দ্রকে, কিন্তু দেখতে দেখতে বদলে গেল দিনগুলো। এখন ভীম সর্দারই চালিত হচ্ছে ইন্দ্রের অমোঘ নিয়ন্ত্রণী শক্তির কুহকে।

চিন্তা করতে করতে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে ভীমের।

মহেন্দ্রনাথকে সে একদিন আশ্বাস দিয়েছিল তার অবর্তমানে ইন্দ্রের শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্ব তার কিন্তু কি মিথ্যা আশ্বাসই দিয়েছিল ? কি ভুলই না করেছিল সেদিন ? তার সাধ্য কি ইন্দ্রের দায়িত্ব নেবে ?

প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে যেমন সমস্ত প্রকৃতি শান্ত নিথর হয়ে যায় তেমনি একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছে ভীম। ঝড় একটা তুলবেই ইন্দ্র, যা হয় তো এক অকল্পনীয় পরিস্থিতির মধ্যেই

ঠেলে নিয়ে যাবে সকলকে। তবু তাকে বিরক্ত করবার দুঃসাহস নেই ভীমের।
সমস্ত দিন তাই এক চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যে দিয়েই কাটে তার। তার আর ইন্দ্রের মাঝখানে একটা অদৃশ্য প্রাচীর কখন তৈরী হয়ে গেল বিস্ময়ের সঙ্গে সেই কথাই চিন্তা করে শুধু।
একসময় দিনের অবসানে রাত্রি নামে। ভীম লক্ষ্য করে সমস্ত দিনের সকল নিশ্চেষ্টতা ঝেড়ে ফেলে একটা সুপ্ত সিংহ যেন জেগে উঠল ইন্দ্রের মধ্যে।
আজকের অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হবার আগে বিশেষভাবেই তৈরী হয়ে নেয় ইন্দ্রনাথ। আজ তার যোদ্ধৃবেশ। বক্ষস্থল আবৃত করে নেয় লৌহজালিকে; কোমরবন্ধে শাণিত তলোয়ার। সঙ্গে নেয় ঈষৎ বক্র দীর্ঘফলা খঞ্জর এবং বিঘৎ-পরিমাণ এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা।
সমস্ত প্রস্তুতি সাঙ্গ হলে ইন্দ্র অশ্বশালায় গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রভুর উপস্থিতিতে অশ্বগুলি মৃদু হর্ষধ্বনি করে ওঠে। সব অশ্বই শিক্ষিত, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমণে সক্ষম। তবুও প্রিয়তম শ্বেতবর্ণের অশ্বটিই ইন্দ্র আজকের অভিযানের জন্য নির্বাচন করে। অশ্বের বল্গা ধরে সে বাইরে নিয়ে আসে, প্রাসাদের সম্মুখের প্রশস্ত চত্বর অতিক্রম করে। তারপর ন্যূনতম দৈহিক প্রচেষ্টায় অশ্বের সওয়ার হয়। ইন্দ্রের দুইজানুর মৃদু চাপে শিক্ষিত অশ্ব গতিশীল হয়— এগিয়ে চলে সম্মুখের পথে।
আপাতত ইন্দ্রের গন্তব্য রুদ্রদেবের গড়।
প্রাসাদ থেকে অর্ধক্রোশ কি তদপেক্ষা সামান্য বেশী পথ অতিক্রম করে আসার পর ইন্দ্র হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে। সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই অন্য কোন অশ্বারোহী তাকে অনুসরণ করে আসছে।
সাথে সাথে ইন্দ্র অশ্বের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঘনপত্রাবৃত এক

বৃক্ষের তলদেশে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চল ছায়ামূর্তির মতো আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই পশ্চাদানুসরণকারী অশ্বারোহীও বৃক্ষের তলদেশে এসে পৌঁছায় এবং ইন্দ্র কোন প্রশ্ন করবার পূর্বেই তার উদ্দেশ্যে বলে ওঠে; থামলে কেন? কণ্ঠস্বর চিনতে ইন্দ্রের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে; তুমি?

—হ্যাঁ আমি, ভীম। আজ আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমাকে কিছুতেই তুমি বাধা দিতে পারবে না।

—কিন্তু সেখানে যে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা সর্দার।

উত্তর দিতে গিয়ে ভীমের ঠোঁটের কোণে একটুকরো তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে শুধু; অন্ধকারের মধ্যে ইন্দ্রের তা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ভীমের কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে, চাপা উত্তেজনার আভাস খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না।

—আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছ দাদো? কেন ভীম কি কোনদিন বিপদের অশঙ্কা করেছে? আর তাছাড়া তুমি যে বিপদের মধ্যে যেতে পার সেখানে কি আমি যেতে পারি না? ভীমের কি রক্ত জল হয়ে গেছে?

শেষদিকে অভিমানে ভীমের কণ্ঠ যেন ভিজে ওঠে। তার অভিমানের কারণ বুঝতে বিলম্ব হয় না ইন্দ্রের। আগুন নিয়ে যে খেলা সে খেলতে চলেছে তার কোন সংবাদই যে তাকে জানায়নি বলে সর্দারের এই অভিমান।

সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ইন্দ্রনাথ। পাহাড়ের মতো অটল এই মানুষটা সঙ্গী থাকলে নিরাপত্তা ও মনের শক্তি দুই বাড়ে বইকি। লাঠি হাতে থাকলে এই প্রৌঢ় বয়সেও ভীম একাই একশো। ইন্দ্রের চেয়ে ভালো একথা আর কে জানে? তাই প্রশ্নের স্বরেই

বলে ; তার মানে, আজ তুমি আমার সঙ্গী হবেই।

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে নিষেধ করো না। করলেও আমি শুনব না। যদি আজ আমি তোমাকে একা ছেড়ে দি তবে স্বর্গ থেকে তাঁর আত্মা আমাকে ক্ষমা করবে না! অভিশাপ দেবে। সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

ইন্দ্র আর কথা বাড়ায় না, শুধু বলে ; চল সর্দ্দার, আমি নিষেধ করব না। তাছাড়া তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মনে হাজারগুণ বেশী শক্তি পাই। তোমার চেয়ে বড় সহায় আমার আর কে আছে বল? ইন্দ্রের কথাগুলো শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে দু-চোখ ভরে আসে ভীমের। একটা অবরুদ্ধ আবেগ ঠেলে ওঠে কণ্ঠ পর্যন্ত। অস্ফুট স্বরে শুধু বলতে পারে ; চল।

এখন ওরা দুজনে পাশাপাশি চলে।

চাঁদ এখন ওঠে নি আকাশে, তবু পথের নিশানা পেতে অসুবিধা হয় না। এই পথ ওদের নখদর্পণে, দিশা ভুল হ'বার কোন সম্ভাবনাই নেই। দুজনেরই মনে হয় যেন মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করে চলেছে। ঘোড়ার খুরের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ ছাড়া অন্যকোন শব্দ শোনা যায় না কোথাও। এমনকি ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক পর্যন্ত না।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে ওদের ; কুশীপুরের দূরত্ব দশক্রোশের কম নয়।

সুতরাং অশ্বের গতি বর্দ্ধিত করে দুজনেই। ওরা কেউ কোন কথা বলে না। দুজনেই নিজ-নিজ চিন্তার গহনে ডুবে যায়।

ইন্দ্রের চিন্তা সম্প্রসারিত হয় অজ্ঞানিত ভবিষ্যতে ; ভীমের চিন্তা আবর্ত্তিত হয় অতীতকে কেন্দ্র করে।

ইন্দ্র মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে থাকে চূড়ান্ত অগ্নিপরীক্ষার দিন

সমাগতপ্রায়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি বিদ্রোহের আগুন দিকে দিকে জ্বালিয়ে তোলা যায় তবে করসংগ্রাহকেরা এর পরে প্রতি জনপদেই বাধার সম্মুখীন হবে। তখন তারা সাহায্য নেবে স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের। তাদের নির্বিচার অত্যাচারের সামনে স্থানীয় মানুষদের দিয়েই বাধার প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য। আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমনের প্রাথমিক দায়িত্ব ফৌজদারের। সে সক্রিয় প্রয়াস চালাবে এই বিদ্রোহী মনোভাব দমন করবার। ব্যর্থ হলে অনিবার্যভাবেই সাধারণ প্রজার এই রাজদ্রোহিতার সংবাদ পৌঁছবে সুলতানের কানে। অবশ্য চরের মাধ্যমে অনেক পূর্বেও পৌঁছে যেতে পারে এই সংবাদ। প্রজার এই অবাধ্য আচরণ ঘৃতাহুতি দেবে সুলতানের ক্রোধাগ্নিতে। ক্ষমা নেই জুনা খাঁর অন্তরে। ফলে একের পর এক জনপদকে শ্মশানে পরিণত করার আদেশ বর্ষিত হবে সুলতানের বিষাক্ত কণ্ঠ থেকে।

যে পথে ইন্দ্র চলেছে এবং দোয়ারের মানুষকে চালনা করার চেষ্টা করছে এই তো তার শেষ পরিণতি। চোখের সামনে ছবির মতো ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি ভেসে ভেসে ওঠে। সেই ভয়ানক দিনগুলির মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য এখন থেকেই সর্বপ্রযত্নে তৈরী হওয়া দরকার—মনে মনে স্থির করে ফেলে ইন্দ্র।

ভীমের চিন্তা কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত। সে যেন চোখের সামনে তার সমগ্র অতীতকে প্রত্যক্ষ করে। দেখতে দেখতে কেটে গেল বছরগুলি। বুনো হাতির মতো দুর্ধর্ষ ভীম সর্দারও বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শেষে একদিন স্থবির হয়ে যাবে। সমস্ত অস্থিরতা থেমে যাবে এক দিন।

কিন্তু সে তো এখনও অদূর-ভবিষ্যতের ভাবনা। ভীম তো এখনও স্থবির হয়ে পড়ে নি। এখনও তার শরীরে মত্তহস্তীর বল।

আবার অতীত রোমন্থন করে ভীম।

শুধুমাত্র এই অস্থিরতার জন্যই যৌবন বয়সে ভীম কোথাও স্থায়ী-ভাবে গোলামী করতে পারে নি। কত প্রভুর নিমকই না খেয়েছে সে। কিন্তু কেউ তাকে পোষ মানাতে পারে নি। সামান্য কারণে কিম্বা একেবারে বিনা কারণে কাজ ছেড়ে দিয়ে একস্থান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। স্থায়ীভাবে কোথাও তার মন বসে নি। শেষবার আশ্রয় নিয়েছিল মহেন্দ্রনাথের কাছে। বন্য হস্তী পোষ মেনেছিল শেষপর্যন্ত। মহেন্দ্রনাথের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব তাকে একেবারে বশ করে ফেলেছিল। তারপর এল ইন্দ্রনাথ। সন্তানহীন ভীম সর্দার। বুকের ধন করে তুলল পরের সন্তানকে।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক কোনদিনই ছিল না মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে। ইন্দ্রের জন্মের পর থেকে শেষ ব্যবধানটুকুও ঘুচে গেল। ভীম সংসারের একজন হয়ে উঠল। মহেন্দ্রনাথ ভীমকে ইন্দ্রের অভিভাবক এবং পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মর্যাদাই দিতেন। ইন্দ্রও যে কোনদিন সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে—এমন কথা বলতে পারবে না ভীম। আজও তো সে স্বীকার করেই নিল ভীম সর্দারের চেয়ে বড় সহায় আর তার কেউ নেই।

চিন্তাটা বহুদিন পরে ভারী স্বস্তি দেয় ভীমকে। তার বুকের উপর থেকে একটা ভারী পাথর নেমে যায় যেন।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ শিসের মতো একটা শব্দে ভীমের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। সচকিত প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তার কণ্ঠ থেকে।

—কি হলো দাদো?

—পূবদিকে তাকাও।

ভীমের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেদিকে নিবদ্ধ হয়। সমস্ত আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঊর্দ্ধাকাশ পরিক্রমণের নিষ্ফল

কামনায় শূন্যে ভেসে উঠে নিভে নিভে যাচ্ছে।

—বন্দীপুর মনে হচ্ছে না? ভীমের কণ্ঠে প্রশ্নটা অর্দ্ধস্ফুট থেকে যায়।

—হ্যাঁ তাই মনে হচ্ছে।

এখন কি করবে?

—ঘোড়ার মুখ ঘোরাও। যাব বন্দীপুর। অদৃশ্য স্থান থেকেও তো অন্তত একবার লক্ষ্য করা যাবে প্রকৃত অত্যাচারের রূপটা।

নির্দ্দেশ দেয় ইন্দ্র।

চকিতে গতিমুখ পরিবর্তন করে দুই আরোহী। ধনুক থেকে নিক্রান্ত তীরের মতো সিধা ছুটে চলে বন্দীপুরের দিকে।

যতই গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী হয় ততই নিরীহ মানুষের সম্মিলিত আর্ত্ত চিৎকার স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওদের কানের পর্দায় এসে আছড়ে পড়ে। ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে ইন্দ্রের কণ্ঠ যেন জলভারাক্রান্ত মেঘের মতো শোনায়।

—না, আজও কোন প্রতিরোধ দেওয়া গেল না ওরা আজও নির্বিচার অত্যাচার চালিয়ে ফিরে যাবে। উঃ অসহ্য!

ভীম শোনে সবই, ইন্দ্রের অন্তরের তীব্র যন্ত্রণাকেও অনুভব করে

কিন্তু মুখে বলে না কিছু।

কয়েকদণ্ডের মধ্যেই ওরা পার হয়ে আসে আধক্রোশ পথ।

বন্দীপুরের পশ্চিমপ্রান্ত জুড়ে এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। গহন কিন্তু দুর্ভেদ্য নয়। যাত্রা স্থগিত করে সেখানে এসে।

অনেক পায়ে চলা পথ এই বনভূমির বুক চিরে তৈরী হয়েছে দিনে দিনে। এমনি এক পথের প্রবেশমুখে এক দেবদারু বৃক্ষের কাছে অশ্বদুটিকে বেঁধে ওরা দুজন ক্ষিপ্র অথচ নিঃশব্দ পায়ে বনভূমি অতিক্রম করতে থাকে অসংখ্য মানুষের আর্ত্ত কলরোলে বনভূমি

পর্যন্ত উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সম্পূর্ণ বনভূমি অতিক্রম করার আগেই এক বীভৎস অত্যাচারের নগ্ন দৃষ্টান্ত ওদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বনের প্রান্তিক সীমা বরাবর একখণ্ড চতুষ্কোণ জমি। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। রাখাল বালকেরা সম্ভবতঃ স্থানটিকে তাদের ক্রীড়াঙ্গনরূপে ব্যবহার করত। সেখানে ওরা অভিনীত হতে দেখে এক নারকীয় দৃশ্য। পাঁচজন মানুষের একটি উপদল।

অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে এরা কর-সংগ্রাহকদের সাহায্যকারী কোন ফৌজের একটি ক্ষুদ্রাংশ। দলের চারজন ভয়ত্রস্তা এক কিশোরীকে ঘিরে উন্মাদ লোলুপতায় নৃত্য করছে। একটি লোকের হাতে জ্বলন্ত মশাল। সম্ভবতঃ দলের সর্দার পঞ্চম ব্যক্তিটি সেই অসহায়া কিশোরীকে তার সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে বিবস্ত্রা করবার পাশবিক প্রয়াসে তৎপর। মশালের বিকীর্ণ আলোয় সমস্ত স্থানটি প্রেতপুরীর মতো বীভৎস মনে হয়।

ভীমের বিদ্রোহীরক্ত ফুঁসে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুটে বলে : দাদো, একবার হুকুম দাও। লাঠির ঘায়ে পাঁচটারই মাথা ভেঙে দি।

—ভুলে যাচ্ছ কেন সর্দার, ওরাও কেউ দুর্বল নয়।

—কিন্তু ভীমের হাতে লাঠি আর ইন্দ্রের হাতে তলোয়ার থাকলে পাঁচ জনও যে কিছু নয়—সেও তো তুমি ভালোই জানো।

জানি.; অবুঝ ভীমকে বোঝাতে চায় ইন্দ্রনাথ, কিন্তু এভাবে ওদের আক্রমণ করলে ওরাও মরণপন লড়বে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা, ওরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে। দুভাবে ক্ষতি হবে তাতে। ওদের চিৎকারে স্বভাবতই আরো অনেকে ছুটে আসবে। দ্বিতীয়ত, যাকে বাঁচাতে লড়ব আমরা অবধারিত সেও আহত হবে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

—কিন্তু তাই বলে এই নির্যাতন দেখতে হবে মুখ বুজে ?

—না, কখনো না। কিন্তু কাজ উদ্ধার করতে হবে কৌশলে।

—কি ভাবে ?

—এই দেখ; নিজের কোমর বন্ধ থেকে শাণিত ছুরিকা খুলে নেয় ইন্দ্রনাথ। তারপর সেটিকে ভীমের বিস্ফারিত দুই চোখের সামনে তুলে ধরে বলে; এটাই প্রথম মারণাস্ত্র।

কৌশলটা ভীমের অবোধ্য মনে হয়। জিজ্ঞাসা করে; এটা দিয়ে কি হবে ?

—ওই চারজনের মধ্যে যার হাতে মশাল তাকে বিঁধে দিচ্ছি আমি। তখন অন্ধকারের মধ্যে ওরা অনেকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সেই সময় তোমার লাঠির খেলা দেখিও। কিন্তু সাবধান মেয়েটাকেই জখম করে দিও না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কব্জির সাবলীল মোচড়ে ছুরিটা নিক্ষেপ করে ইন্দ্র। মশালের আভায় পলকের জন্য এক ঝলক বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে ফলাটা, তারপর অব্যর্থ লক্ষ্য সন্ধান করে। মুহূর্তপূর্বের হর্ষধ্বনি একটা অন্তিম আর্তনাদের তলায় চাপা পড়ে যায়।

—সাবাশ !

একটা অর্ধোচ্চারিত প্রশংসাধ্বনি ভীমের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়।

মশাল ধারীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে মশালটিও সজোরে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করে নিভে যায়।

সাথে সাথে চতুর্দ্দিকে ঘন অন্ধকারের যবনিকা নেমে আসে। আকাশের একফালি চাঁদ ঘনের বেষ্টনী ভেদ করে সামান্য আলো বিতরণ করতেও ব্যর্থ হয়।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে দলের অন্যান্য সভ্যেরা। লোভকে ছাপিয়ে ওঠে মৃত্যুভয়।

কিন্তু কোন কিছু ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই ওদের উপর নেমে আসে অদৃশ্য হাতের কঠোরতম বিধান।

প্রতিরোধ তো দূরের কথা, শেষ-চিৎকারটুকুও ফোটে না ওদের কণ্ঠে। সম্ভোগলিপ্সু মানুষগুলো রুধিরাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু এরই মধ্যে একজন পশুসুলভ ক্ষিপ্রতায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। সে দলের পঞ্চমব্যক্তি। যাবার সময় সে তার শিকারটিকেও ছেড়ে যায় না।

পশ্চাৎপটের গভীর বনের গহন-অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে দেয় সে। তার সুকঠিন বাহুপাশে একটি নারীদেহ মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে ওঠে, কিন্তু সামান্যতম কাতরোক্তি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার সুযোগ পায় না সে।

অন্যদিকে সেই সূচীবিদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ইন্দ্র এবং ভীম অসহায়ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। বিপদ এসেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। এখন দুজনেই বুঝতে পারে ওদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। শিকারী তার শিকারকে করায়ত্ত করে অন্ধকারের ঘন যবনিকার অন্তরালে আত্মগোপন করেছে।

কিন্তু সে কোন্ দিকে? এই গহন বনের অভ্যন্তরে কোথায় অনুসন্ধান করবে অদৃশ্য শত্রুর? অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই চলে না। ইন্দ্র নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করতে থাকে।

পরমুহূর্তে পরম বিতৃষ্ণা জাগে নিজের উপর। তার উপস্থিতি সত্ত্বেও এক যবন অপহরণ করে নিয়ে গেল এক নারীকে, সে কোনই বাধা দিতে পারল না। হেরে গেল বুদ্ধির খেলায়।

অন্তর্জ্বালায় যেন দগ্ধ হয়ে যেতে চায় তার হৃদয়।

সহসা কয়েকশতহস্ত দূরত্বে বনান্তরাল থেকে ভেসে আসে নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার। অর্ধোচ্চারিত মাত্র; কারণ সহজেই অনুমান করা যায় সম্পূর্ণ উচ্চারিত হবার পূর্বেই কঠিন আঘাতে কেউ সে রব রুদ্ধ করে দিল।

তবু সেই ধ্বনিটুকুই দুজনের পক্ষে দিক্ নির্ণয়ের কাজ করে। দুরন্তবেগে ওরা সেই শব্দ অনুসরণ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে কিন্তু পথ লতাজালজটিল; সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ওদের গতি বার বার ব্যাহত হয়। শেষপর্যন্ত ওদের থামাতেই হয়। এখন আর কোথাও শব্দের কোন রেশ নেই। এবার কোন্ দিকে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ধারালো ফলায় সেই পুঞ্জ-পুঞ্জ তমিস্রাকেও ওরা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে চায়। ক্ষীণ-তম শব্দস্পন্দনগুলোকেও চায় অভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করতে।

কি দুঃসহ প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়ে কাটে সময়! প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটা বছর। দুজনেই অনুভব করে ক্ষণিক বিলম্বের সূত্রে রমণীর জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ সম্পদ হয়তো লুণ্ঠিত হবে ঐ বর্বরটির হাতে। কিন্তু উপায় কি? পথের নিশানা কোথায়? অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চকিতে আবার একটা ঈপ্সিত ইঙ্গিত ভেসে আসে। এবার একটা অস্ফুট কাতরোক্তি। শব্দ অতি ক্ষীণ, কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে শব্দের উৎস অতি নিকটেই। ঈষৎ দক্ষিণে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র ও ভীমের শরীর ধনুকের ছিলার মতো টান-টান হয়ে ওঠে। এই হয়তো শেষ সংকেত এবং শেষতম সুযোগও। সুতরাং একে কাজে লাগাতেই হবে। তাছাড়াও অদৃশ্য শত্রুর মতো বিপজ্জনক আর কিছু নেই। তাই অত্যন্ত সাবধানে ও

স্থিরমস্তিষ্কে ইতিকর্তব্য নির্ণয় করা দরকার।
অকস্মাৎ ইন্দ্রের মস্তিষ্কের কোষে কোষে আলো জ্বলে ওঠে যেন। কৌশলে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখলে কেমন হয়? তৎক্ষণাৎ অনুচ্চ অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে ইন্দ্র বলে ওঠে; সর্দ্দার, ওই যে ওই পালাচ্ছে! দেখতে পাচ্ছ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুরুভার বস্তুর পতনশব্দ ওদের কানে আসে। পরক্ষণেই শুষ্ক পত্ররাজির উপর দ্রুতধাবমান পদশব্দ শোনা যায়—দূর থেকে দূরে ক্রমশঃ সেই শব্দ হারিয়ে যায়।
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা ওদের কারোরই উদ্দেশ্য নয়, ওরা তা করেও না। কৌশলেই কার্যোদ্ধার হয়েছে। এখন প্রয়োজন যতশীঘ্র সম্ভব অপহৃতা সেই কিশোরীকে উদ্ধার করে বিপদ-সীমার বাইরে নিষ্ক্রান্ত হওয়া। বুভুক্ষু নেকড়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং খুবই সম্ভব যে কোন মুহূর্তে পাল্টা আক্রমণ হানবার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
পরক্ষণে দুজনে সচকিত হয়ে ওঠে। সামান্য দূরত্ব থেকে অস্পষ্ট হলেও আর একবার সকরুণ কাতরোক্তি শোনা যায়, স্পষ্টতঃ নারীকণ্ঠের। ইন্দ্র অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে; তুমি কোথায়? কতদূরে?

কোন প্রত্যুত্তর শোনা যায় না।

—আমরা শত্রু নই, তোমার প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছি।

অদৃশ্য কিশোরীকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বলে ইন্দ্র।
এবারও উত্তর নেই।

ওদের বুঝতে বিলম্ব হয় না, সংজ্ঞাহীনা হয়ে গেছে কিশোরী।

সুতরাং সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করেই ওরা দুজনে অগ্রসর হয়। কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র. অভীষ্ট স্থানে পৌছে যায় দুজনে। তমিস্রার মধ্যেও কোন শ্বেতাভ বস্তুপিণ্ডকে যেমন তার আভাসেই চিহ্নিত করা যায় তেমনি এক্ষেত্রেও আভাসেই নারীদেহটিকে দুজনে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকল দ্বিধাকে সে সবলে ঝেড়ে ফেলে। যেখানে প্রচণ্ড বিপদ তার দন্তুর জিঘাংসা নিয়ে হাঁ করে আছে সেখানে জীবনের ছোটখাটো ঔচিত্যবোধ নিয়ে বিব্রত হওয়ার অর্থ আর যাই হোক বুদ্ধিমত্তা নয়।

সুতরাং ইন্দ্র নত হয়ে অবলীলাক্রমে দেহটিকে দুই আজানুহস্তের আকর্ষণে ভূমি থেকে তুলে নেয় এবং যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে। পিছনে সদাসতর্ক ভীম। ভীমের মনে হয় রুদ্র শিব যেন মৃতা সতীকে বহন করে নিয়ে চলেছেন।

আপাতত ওদের দুজনেরই লক্ষ্য সেই চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ড, একবার সেখানে পৌছতে পারলেই পায়ে চলা পথটির একটি স্পষ্ট দিশা পাওয়া যাবে। পরে বনভূমির বাইরে নিষ্ক্রান্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ।

বস্তুত ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যই সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দিশাহীন পথ পরিক্রমণে ওদের সাহায্য করে। অমানুষিক প্রচেষ্টায় একসময় দুজনে ঘন বনের বেষ্টনী ভেদ করে সেই চতুষ্কোণ স্থানটিতে উপস্থিত হতে সক্ষম হয়। তারপর অতি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ওরা পরিচিত পথে এগিয়ে চলে। উদ্দেশ্য পথের প্রবেশমুখে ফিরে যাওয়া। সেখানেই তাদের প্রিয় অশ্বদুটি বাঁধা আছে।

পিছনে বাঁধভাঙা উন্মত্ত জল রাশির ভীষণ কল্লোলের মতো গ্রামবাসীর অসহায় আর্তনাদ ভেঙে ভেঙে পড়ে।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে বনপথ অতিক্রম করে উন্মুক্ত স্থানে এসে পৌঁছয় ওরা। তারপর শস্পাচ্ছাদিত ভূমির উপর দেহটিকে সযত্নে নামিয়ে রাখে ইন্দ্র। লতাজালজটিল পথে দেহটিকে দীর্ঘক্ষণ বহনের পরিশ্রমে তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে।

ভীম দ্রুতহস্তে অশ্বের বন্ধনরজ্জু খুলে ফেলে।

আকাশের চাঁদ এখন বিষণ্ণ-পাণ্ডুর আলো বিতরণ করে। সেই অস্পষ্ট আলোয় দৃশ্যমান জগৎকে ইন্দ্রের মায়াময় বলে মনে হয়। যা কিছু ঘটে চলেছে সবই যেন অবাস্তব স্বপ্নলোকের কাহিনী। কোন কিছুরই যেন কোন বাস্তব পটভূমি নেই।

পরমুহূর্তেই রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসে ইন্দ্র। মন সাবধানী হয়ে ওঠে। এখন স্বপ্নবিলাসের সময় নয়, স্থিরমস্তিষ্কে ইতিকর্তব্য নির্ণয়ের সময়। এখন যত শীঘ্র এই বিপদসীমা অতিক্রম করে দূরে চলে যাওয়া যায় ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। অথচ তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন লুপ্ত সংজ্ঞা কিশোরীকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনা।

এখন তাদের দুজনের শুভাশুভের সঙ্গে অপর একজনের ভাগ্যও জড়িয়ে পড়েছে অলক্ষিতে। তাকে ফেলে রেখে এই স্থান ত্যাগ করা সম্ভব নয় কিছুতেই। বিপদ শিয়রে জেনেও ওরা দুজন তাই অতন্দ্র প্রহরীর প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় খুঁজে পায় না।

কিন্তু খুব বেশী সময় ওদের অপেক্ষা করতে হয় না। মুক্ত বাতাসে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরে আসে কিশোরীর। চেতনার স্তরে স্তরে প্রথমে ছোট-ছোট অভিঘাতগুলি জাগে, আবার হারিয়ে যায়। তারপর একসময় সমস্ত স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুব দ্রুত পরম্পরায় ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণগুলো মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে

তীব্র ভীতিবোধ গ্রাস করে তার সমস্ত সত্তাকে, বুক চিরে বেরিয়ে আসে ভয়ার্ত অর্ধস্ফুট একটা রব। পরমুহূর্তে জাগে আত্মরক্ষার চিন্তা। তড়িৎগতিতে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসে। ইন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সব। এতক্ষণে বাঙ্ময় হয় তার কণ্ঠ।
বৃথাই আশঙ্কা করছ, আমরা কেউ শত্রু নই।
সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে যে আশ্বাসবাণী প্রতিধ্বনিত হয় সম্ভবত তা ভীত-সন্ত্রস্ত রমণীহৃদয়কে অনেকাংশে আশ্বস্ত করে। তবু ক্ষীণ সন্দেহের রেশ থেকে যায় তার পরবর্তী প্রশ্নে।
—আপনি কে? এ কোন্ স্থান?
—আমার নাম ইন্দ্রনাথ, এই স্থান বন্দীপুরের পার্শ্ববর্তী তৃণ ক্ষেত্র।
চকিতে একটা দুরন্ত আবেগ কিশোরীর সমগ্র হৃদয়কে মথিত করে দেয় যেন। দোয়াবের আবালবৃদ্ধবনিতার স্বপ্নের নায়ক ইন্দ্রনাথ তার সামনে—
এ কি অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। কেমন করে এ অঘটন সম্ভব হল? অজস্র চিন্তার উদ্বেল ঢেউ আছড়ে পড়ে তার হৃদয়তটে। আবেগ তার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে মূক করে দেয়।
কিছু একটা শোনার প্রত্যাশায় কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করে অসহিষ্ণু কণ্ঠে ইন্দ্রনাথ বলে ওঠে; আমাদের এখনি এই স্থান ত্যাগ করা দরকার। তোমাকে ক্ষুধার্ত একদল নেকড়ের মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছি আমরা। সুতরাং যে কোন সময়ে আবার ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।
—আমাকে কি এখানে একা রেখে যাবেন?
শঙ্কাকুল প্রশ্ন ভেঙে পড়ে কিশোরীর কণ্ঠে।
—না, কিন্তু তোমাকে আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। এছাড়া অন্যকোন পথ নেই।

—আমরা কতদূর যাব?

—আপাতত তিনক্রোশ পথ।

—আমার মায়ের কি হবে?

—তিনি কোথায়?

—জল্লাদেরা যখন আমায় ধরে নিয়ে আসে তখনও ঘরেই ছিলেন। ওরা ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল। জানি না মা বেঁচে আছে কি না?

কিভাবে এই কিশোরীকে সান্ত্বনার ভাষা শোনাবে৷ ইন্দ্র বুঝে ওঠে না। তবু বলে; এখন কোন মতে তার সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে আগামীকালই আমি তার সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করব।

প্রত্যুত্তরের জন্য তিলমাত্র বিলম্ব করে না ইন্দ্রনাথ. নিজের অশ্বে আরূঢ় হয় তৎক্ষণাৎ এবং বামপার্শ্বে অনেকখানি আনত হয়ে দুইহাত প্রসারিত করে অপরিচিতার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়।

—এস, আমার হাত ধর।

যার উদ্দেশ্যে আহ্বান নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মতো সে দাঁড়িয়েই থাকে। দ্বিধা, সংকোচ লজ্জা ও ভয়ের বিমিশ্র অনুভূতি চলচ্ছক্তিহীন করে দেয় তাকে। ইন্দ্র অভ্রান্তভাবেই অনুমান করতে পারে তার নিশ্চলতার গূঢ় কারণ, তবুও ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে; তুমি কি বিপদের গুরুত্ব এখনও উপলব্ধি করতে পারছ না? বিলম্ব করবার সময় নেই। আমার হাত ধর।

এবার সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে অগ্রবর্তিনী হয় কিশোরী। দুই মৃণাল বাহু প্রসারিত করে দেয় অশ্বারূঢ় ইন্দ্রের দিকে। পরক্ষণেই তার দেহটি চকিত আকর্ষণে উৎক্ষিপ্ত হয় ভূমি থেকে এবং ভালো-ভাবে কিছু অনুমান করার পূর্বেই অশ্বপৃষ্ঠে আসীনা হয় সে—

পশ্চাতে দেহের প্রাচীর, দুপাশে দুই বলিষ্ঠ হাতের বেষ্টনীর মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার হৃদপিণ্ডের মধ্যে ছুটে আসে। অদম্য তৃষ্ণায় বুক যেন ফেটে যেতে চায়। শরীরের কোষে তড়িৎ প্রবাহ বয়ে চলে। মনে হয় এ যদি অলীক স্বপ্নও হয় তবে সেই স্বপ্ন অক্ষয় হোক্।

ইত্যবসরে গতিশীল হয় অশ্বটি। পশ্চাদ্বর্তী ভীমসর্দ্দারকে কোন নির্দ্দেশ দেবারই প্রয়োজন হয় না, অদৃশ্য আকর্ষণেই যেন সে ইন্দ্রকে অনুসরণ করে।

তারপর ক্ষণে-ক্ষণেই অশ্বের গতিবেগ বর্দ্ধিত হতে থাকে। পশ্চাতে গ্রামবাসীর আর্ত কোলাহল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়। জনহীন নৈশব্দের মধ্যে দ্রুত-ধাবমান অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় মাত্র।

—এখন কোন দিকে?

পিছন থেকে ভীমের অনুচ্চ কণ্ঠ শোনা যায়।

—রুদ্রদেবের গড়ের দিকেই যাব, তবে একটু ঘুরপথে বরণ হয়ে। সেখানে নরোত্তম ওঝার ঘরে রেখে যেতে চাই একে।

ইন্দ্র উত্তর দেয়।

তারপর কেউ কোন কথা বলে না। প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই অন্তরের গহণতম প্রদেশে চিন্তার অবিশ্রান্ত ঢেউ ওঠে আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।

বস্তুত তিনজনের চিন্তাই একই কেন্দ্রে আবর্তিত হয়। তিনজনেই ভাবে অনাগত ভবিষ্যতের কথা, তার গর্ভে কোন নবতর ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে।

সময় কেটে যেতে থাকে প্রাকৃতিক নিয়মে। দুরন্ত গতি অশ্ব পথ

পরিক্রমণ করে। সম্মুখের পথ একসময় পিছনে হারিয়ে যায়। অবশেষে তিনজনেই যেন নিজ নিজ চিন্তার গহন থেকে বাস্তবে ফিরে আসে; গন্তব্য স্থলে এসে পৌছানো গেছে। ইন্দ্র ও ভীম লাফিয়ে নামে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। পরে ইন্দ্র কিশোরীকে অবতরণে সাহায্য করে।

ভীমকে কোন নির্দ্দেশ দেবারও প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রের অন্তরের কথা সে অভ্রান্তভাবেই অনুমান করে। সামনের দিকে এগিয়ে যায় খানিকটা। মৃদু আঘাত করে সম্মুখস্থ গৃহের বন্ধ দরজায়।

ভিতর থেকে কোন সাড়া আসে না। প্রেতপুরীর মতো নির্জন মনে হয় চারদিক। ভীম তখন আবার বন্ধদরজায় আঘাত করে। এবার পূর্বাপেক্ষা শব্দের প্রাবল্য বেশী। চূড়ান্ত নৈঃশব্দের মধ্যে সেই শব্দ ভয়ংকর শোনায়। সামান্য পরে ভিতর থেকে সচকিত প্রশ্ন ভেসে আসে।

—কে ?

—আমি ভীম, সঙ্গে দাদো আছে।

স্বল্পকাল পরে দরজা সকলের সম্মুখে অবারিত হয়। প্রদীপ হাতে নরোত্তম বাইরে আসেন। বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু শরীর এখনও টান। বিস্মিত প্রশ্ন ভেঙ্গে পড়ে তার কণ্ঠে।

—আপনি ? রুদ্রদেবের গড়ে যান নি ? কোন খারাপ সংবাদ আছে ?

—রুদ্রদেবের গড়েই যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে বন্দীপুরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। দেখলাম সেখানে আগুন জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে করসংগ্রাহকদের প্রসাদপুষ্ট ফৌজ অগ্নি সংযোগ করেছে গ্রামের ঘরবাড়িতে। ছুটলাম সেখানে; চারদিকে চলছে বীভৎস অত্যাচার।

—কি রকম ?

—লুঠপাট, নারী-নির্যাতন সবই। তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ওই দেখুন আপনার সামনে। ইন্দ্র সামান্য দূরে দাঁড়ানো কিশোরীর দিকে নরোত্তমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নরোত্তম পলকের জন্য একবার চোখ তুলে দেখেন, তারপর সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলেন ; আমার পরে কি নির্দ্দেশ ?

—একে আপনার গৃহে রাখুন যতদিন অন্যকোন ব্যবস্থা না করা যায়। এর নিরাপত্তা এবং সম্মান আপাতত আপনার হাতে।

নরোত্তম কোনো কথা বলেন না, কিন্তু তার মস্তকের ঈষৎ আন্দোলনই অভ্রান্তভাবে বলে দেয় যে তিনি এই ভার গ্রহণ করতে অস্বীকৃত নন।

ইন্দ্র এবার পিছনে ফেরে এবং কিশোরীর ঠিক মুখোমুখি দাঁড়ায়। মুহূর্তের জন্য বোধহয় তার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। প্রদীপের ম্লান আলোয় কিশোরীকে মনে হয় যেন বিষাদ প্রতিমা। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। দুচোখের সতৃষ্ণ দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ইন্দ্র কথাবলে, যাও। ভিতরে যাও, এখানে তুমি অনেকখানি নিরাপদ। ইনিআমার পিতৃতুল্য—সুতরাং তোমার কোন সংকোচের কারণ নেই।

এতক্ষণে পাষাণের বুকে কথা ফোটে। কিশোরী প্রশ্নকরে, আপনি কোথায় যাবেন ? ইন্দ্রের ভ্রূকুঞ্চিত হয়, তবুও স্নিগ্ধ স্বরেই বলে, সে কথা জেনে তো তোমার কোন লাভ নেই। আর হ্যাঁ, তোমার নাম আমার জানা হয় নি।

—রুক্মিণী।

—রুক্মিনী, তোমার মায়ের সংবাদ আমি যতশীঘ্র সম্ভব তোমাকে দেবার চেষ্টা করব। তুমি মিথ্যা দুশ্চিন্তা কোরো না।

আর কথা বলে না ইন্দ্র। একবার মাত্র উর্দ্ধাকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন

করে রাত্রির গভীরতা অনুমান করার চেষ্টা করে। তারপর দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় অশ্বারূঢ় হয় এবং চকিতচমকের মতো অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে অশ্বসমেত ইন্দ্রের দেহ হারিয়ে যায়। ভীমও তাকে সমান দক্ষতায় অণুসরণ করে।

ওদের পরবর্তী গন্তব্য রুদ্রদেবের গড়।

অপস্হৃয়মান দুই অশ্বারোহীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে নরোত্তমের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ে। বিষন্ন কণ্ঠে কিশোরীকে সম্বোধন করে বলেন ; চল মা, ঘরে চল।

যার উদ্দেশ্যে আহ্বান তার দু-চোখের গভীর থেকে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু নেমে আসে।

(সাত)

বরণ থেকে রুদ্রদেবের গড় সাতক্রোশ পথ।

যে উন্মাদ গতিবেগ নিয়ে ইন্দ্র অশ্বচালনা করে তাতে প্রতিমুহূর্তেই ভীমের আশঙ্কা হয় এই গতির পাল্লায় সে শেষপর্যন্ত পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু অফুরন্ত তার প্রাণশক্তি।

তাই এই প্রৌঢ় বয়সেও সেই প্রাণশক্তিরই জোরে দুর্বার তারুণ্যের সঙ্গে সে সমানে পাল্লা দেয়।

ওরা দু'জনে যখন রুদ্রদেবের গড়ে এসে উপস্থিত হয় তখন রাত বেশ গভীর। চারদিক নিবিড় নিঃস্তব্ধতা। জানা না থাকলে অনুমান করাই কঠিন যে তিনদিকে বেষ্টিত প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ঘন অন্ধকারের আড়ালে গা ঢেকে অপেক্ষা করে আছে।

ইন্দ্রের আগমন-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে একটা প্রাণের সাড়া পড়ে যায়।

দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা মশাল জ্বলে ওঠে। অন্ধকার তাতে তরল হয় না, বরং চতুর্দ্দিকে একটা অতিপ্রাকৃতের পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেন। ইন্দ্র পীতমকে জিজ্ঞাসা করে, সমাবেশে উপস্থিত মানুষের মোটামুটি সংখ্যা কত?

—হাজারের উপর।

নিতান্তই আশাব্যঞ্জক সংবাদ। ইন্দ্র পরবর্তী প্রশ্ন করে, চতুর্দ্দিকে

তোমাদের পূর্ব অনুমান মতো পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে তো?

পীতাম্বর সঙ্গী অর্জ্জুন উত্তর দেয় ইন্দ্রের প্রশ্নের। সে বলে, মালিক, পাহারাদার সংগ্রহ করার ভার ছিল আমার উপর। সুদক্ষ তিনশত লাঠিয়াল এবং একশত তীরন্দাজ গড়ের চতুর্দ্দিকে পাহারায় নিযুক্ত করেছি। প্রয়োজনে তারা প্রাণ পর্যন্ত দান করতে প্রস্তুত আছে।

—তোমরা সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছ অর্জুন। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এতখানি প্রস্তুতি আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

অকৃত্রিম প্রশংসাই ইন্দ্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

সময়ের মিথ্যা অপচয় ঘটাতে চায় না ইন্দ্রনাথ। ভূমি থেকে সামান্য উঁচু একটি স্থান নির্বাচন করে সেখানে উঠে দাঁড়ায়। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তার কণ্ঠ সরব হয়।

—আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। আপনারা সবাই জানেন অগণিত দোয়াববাসীর সাম্প্রতিক দুর্বিষহ অবস্থার কথা। আপনারা শুনেছেন সুলতানের নূতন আদেশ, দেখছেন করসংগ্রাহক রাজকর্মচারীদের বীভৎস অত্যাচারের নগ্নরূপ। কিছুই আপনাদের অজানিত নয়। এও ধ্রুব সত্য যে, দিনে দিনেই বেড়ে চলবে এই অনাচার অত্যাচার, দোয়াবের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের প্রজা বলি হবে এই অত্যাচারের।

উত্তেজনায় ইন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ কাঁপতে থাকে। শোষণ নির্যাতনের নিখুঁত বাস্তব চিত্র একে একে রায়ত-প্রজাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। কখনও উদগ্র ক্রোধে তার কণ্ঠ বজ্রগর্ভ মেঘের মতো কেঁপে কেঁপে ওঠে, কখনও সুগভীর বেদনার ভারে হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত।

ইন্দ্র চায় প্রতিটি মানুষ উদ্বুদ্ধ হোক্, একাত্ম হোক্। দৃঢ়সংকল্প হোক্ নিজ-নিজ অধিকার রক্ষার দাবীতে, প্রতিরোধের দুর্বার শক্তিতে প্রাণিত হোক্।

সেই সংকল্পে কথার পরে কথার মালা সাজিয়ে চলে সে। নিজের হৃদয়ের অগ্নিদহনের আঁচ প্রতিটি হৃদয়ের গহন-গভীরে সঞ্চারিত করে দিতে চায়।

ইন্দ্র বলে চলে, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেও হয়তো আমরা মৃত্যুকেই বরণ করব যদি না জয় ছিনিয়ে নিতে পারি, আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী প্রতিষ্ঠা না করতে পারি। কিন্তু তাতেই বা কি ক্ষতি? অন্ততঃ সে মৃত্যু হবে সম্মানের।

—বেঁচে থাকার জন্যে যে লড়াই সে তো পশুতেও করে আমরা কি তাদের থেকেও নিকৃষ্ট? তবে সমর্থ মানুষ হয়ে সে লড়াই কেন ছেড়ে দেব? শাসকের হাতে চিরদিনই শাসনদণ্ড থাকে। মৃত্যুর আগেও কেন একবার সে হাত ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করব না?

—আমরা প্রত্যেকেই মানুষ, কেউ আমরা ক্লীব নই—একথা প্রমাণের জন্যই আমাদের আগামী দিনের সংগ্রাম। আপনারা সকলে মনে রাখবেন, এই সংগ্রাম কারো একার বাঁচার সংগ্রাম নয়, সংঘবদ্ধ নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম। এতে প্রত্যেকের সমান ভূমিকা। একথা মনে রেখেই আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে, আগামী কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করতে হবে।

—আমরা কি সম্মুখ লড়াই করব?

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ একজন প্রশ্ন করে।

—সম্মুখ লড়াই তখনই সম্ভব যখন দু'পক্ষই হয় প্রায় সমান শক্তি-শালী। আমরা এখনও পূর্ণ শক্তি অর্জন করতে পারি নি। তাই সম্মুখ লড়াই মানেই হল পরাজয়, শক্তির হানি। তাই মনে

রাখবেন এখনকার লড়াই হল প্রচ্ছন্ন অবস্থান থেকে লড়াই; সর্বক্ষেত্রেই আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে। প্রয়োজনে এবং শক্তি বুঝে আমরা অত্যন্ত অতর্কিতে শত্রুর উপর হানা দেব এবং তাদের চূর্ণ করে আবার আত্মগোপন করব। অরণ্য হবে আমাদের ধাত্রী, আমাদের প্রধান আশ্রয়।

ইন্দ্র দীর্ঘ প্রত্যুত্তরে আগামী রণকৌশল ব্যাখ্যা করে।

—আজ বন্দীপুরে চরম অত্যাচার হয়েছে, কাল অন্য যে কোন জনপদে হবার সম্ভাবনা। তার বিরুদ্ধে আমাদের কি প্রস্তুতি নিতে হবে?

অন্য একজন জানতে চায়।

—খুবই সঙ্গত প্রশ্ন; ইন্দ্র বলে চলে, গ্রামগুলোকে দ্রুত ফাঁকা করে ফেলা দরকার। যার যা কিছু সম্বল আছে সঙ্গে নিয়ে অরণ্যে আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়। বিশেষ করে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের অরণ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে। গ্রামের প্রতিটি সমর্থ যুবক এবং তরুণ সদাসতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে।

—সমগ্র দোয়াবে এখনও মানুষের মধ্যে এই প্রতিরোধের সংকল্প দানা বেঁধে ওঠেনি। নিম্ন-দোয়াবের মানুষই প্রধানতঃ আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। সমগ্র দোয়াবের মানুষকে সংঘবদ্ধ না করতে পারলে যথার্থ প্রতিরোধ আমরা কখনোই গড়ে তুলতে পারব না। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছু আছে কি?

অন্য একজন শ্রোতার কণ্ঠ সরব হয়।

ইন্দ্রনাথের মনের গভীরে হাজার আলোর দীপ্তি নিয়ে আশার আলোকবর্তিকা জ্বলে ওঠে। দোয়াবের মানুষ শুধু তার আহ্বানে সাড়াই দেয়নি, তারাও সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে। এই প্রশ্নই তার ইংগিত। সংঘবদ্ধ শক্তির মূল্য তারাও

অনুধাবন করতে শুরু করেছে।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় ইন্দ্রনাথ। বলে, আপনার প্রশ্ন সময়োচিত এবং যথেষ্ট মূল্যবান। বস্তুতঃ, আমাদের সাফল্যই নির্ভর করছে এই সত্যের উপর যে যত সংঘবদ্ধ-ভাবে আমরা পাল্টা জবাব দিতে পারব তত তাড়াতাড়ি রাজধানীর ঘুম ভাঙবে। দোয়াবের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিদ্রোহের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। এর আংশিক দায়িত্ব আমার। আপনারাও এ বিষয়ে প্রত্যেকেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। প্রত্যেকের কাজ অন্যকে সজাগ করা। অনেকে এখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে, ইতিকর্তব্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রয়েছে। তাদের আগামীদিনের পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনাদের। ইন্দ্র আগামী-কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে বলে সকলকে।

অবশেষে রাত্রির মধ্য যামে তারকাখচিত আকাশের তলদেশে সহস্রাধিক মানুষ নবতর সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে যার গন্তব্যে নিঃশব্দে ফিরে চলে।

সেদিন তমিস্রাঘন রাত্রির বুকে ইতিহাসের এক নব-পরিচ্ছেদ রচিত হবার সন্ধিক্ষণ ঘনিয়ে আসে। সুলতানী অপশাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রজাদের বিদ্রোহের আগ্নেয়-সম্ভাবনার বীজটি উপ্ত হয়।

পীতম এবং তার অনুচরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে ভোলে না ইন্দ্রনাথ। তারপর প্রিয়তম অশ্বের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

অবসাদে তার লৌহময় শরীরও যেন বিকল হয়ে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু সামনে এখনও অনেক পথ, বিশ্রাম নেবার অবসর কোথায়? তিক্ত একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে তার অধরে।

পরমুহূর্তে'ই নিজের ভিতরে একটা অপরাধবোধ অনুভব করে ইন্দ্রনাথ। নিজের কথাই ভাবছে স্বার্থপরের মতো; কই ভীম

সর্দ্দারের কথা তো এতক্ষণ তার মনে পড়ে নি, যা কিনা সর্বাগ্রে মনে পড়া উচিত ছিল।

এই দুরন্ত গতির পাল্লায় একটা প্রৌঢ় মানুষকে সে সারাক্ষণ ব্যতি-ব্যস্ত করে রেখেছে। ভীমসর্দ্দার প্রাণ দেবে, কিন্তু তবু পরাজয় স্বীকার করবে না। কিন্তু তা বলেই হঠকারীর মতো তার প্রতি আচরণ করতে হবে, এটা অপরাধ বই অন্য কিছু নয়।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রনাথ, সর্দ্দার, ক্লান্ত লাগছে তাই না?

—হ্যাঁ, চলো দাদো, এবার ঘরের দিকে ফিরি। আশ্চর্য কি জানো, আজকাল ভীম সর্দ্দারও ক্লান্তি বোধ করে।

—সর্দ্দার যখন ক্লান্তি বোধ করছে তখন ঘরে তো ফিরতেই হবে। হেসে ওঠে ইন্দ্রনাথ, সঙ্গে ভীমও।

দুজনে আবার পথ-পরিক্রমণ শুরু করে।

অশ্বের গতি এবার কিছু মন্থর। এখন আপাতত গতির ব্যস্ততা নেই; আকাশে শুকতারা জ্বল জ্বল করতে থাকে।

(আট)

মানবজীবনে এমন সময় কখনও কখনও আসে যখন জীবনকে মনে হয় ছিন্নমূল, সময় যেন গতিহীন অনড়তা প্রাপ্ত হয়েছে।

সেই অভিশপ্ত রাতের পর সপ্তাহকাল সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, সুতীব্র উৎকণ্ঠা এবং প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে রুক্মিণী জীবন যেন তার কাছে বড়ই দুর্ভার কোনখানেই যেন কোন আশ্রয় নেই। মায়ের কুশল সংবাদ পাওয়ার জন্য তার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করতে থাকে।

বৃদ্ধ নরোত্তম তাকে সান্ত্বনা দেন। নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে মনের ভার হাল্কা করার চেষ্টা করেন।

নরোত্তম সন্তানহীন। তাই প্রথমাবধি রুক্মিণীর প্রতি স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ উপজাত হয়েছে। রুক্মিণী যেন তাদের চোখের মনি। অশত স্নেহের রুদ্ধ মুখ খুলে গিয়ে স্বতোৎ-সারিত আশীর্বাদের মতো তা অকৃপণ ধারায় রুক্মিণীর উপর বর্ষিত হচ্ছে।

মুখে রুক্মিণীকে প্রবোধ দেন নরোত্তম কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন না। ইন্দ্রনাথের স্বভাব তার অজানা নয়। আশ্চর্য প্রখর এই যুবকের কর্তব্য বুদ্ধি। সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করার লোক নয় সে।

তবে কি সে রুক্মিণীর মায়ের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ

হয়েছে? কিম্বা তাঁর সম্বন্ধে কোন অনভিপ্রেত সংবাদ কন্যার কর্ণগোচর করতে চায় না বলেই নীরব? নাকি নিজেই কোন নতুন বিপদের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ল?

তৃতীয় সম্ভাবনার কথাই সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠিত করে তোলে নরোত্তমকে। সমস্ত ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে আনুপূর্বিক সম্পৃক্ততা না থাকলেও আভাসে তাদের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। তাই তিনি অভ্রান্তভাবেই জানেন সমস্ত কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দুতে একটিমাত্র মানুষ। দোয়াবের প্রান্ত-প্রত্যন্তে বিদ্রোহের যে সমিধ সংগৃহীত হয়েছে তাতে অগ্নিসংযোগের দুরূহতম কার্যভার এই একটিমাত্র যুবকের স্কন্ধে ন্যস্ত। তার কোন বিপদ-সম্ভাবনার অর্থই হল সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যাওয়া।

তাছাড়া ইন্দ্রনাথের কোন বিপদশঙ্কা তিনি কেন, তার বিশ্বাস দোয়াবের কোন মানুষই স্বপ্নের অগোচরেও তেমন কথা মনে আনতেও চায় না। তবুও চিন্তাগুলো ঘুরে ফিরে আসেই। মনের স্বভাবই এই। কিছুতেই তিনি মনকে স্থির করতে পারেন না।
কিন্তু রুক্মিণীকে অন্য কথা বোঝান। বলেন, তুমি বুঝছ না মা, সে কত ব্যস্ত। দোয়াবের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঠিক একটা উল্কার মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। না হলে তোমার মায়ের সংবাদ দেবার দায়িত্ব ভুলে থাকার মানুষ নয় সে।

রুক্মিণী যে নরোত্তমের কথা বোঝে না তা নয়। নরোত্তম তাকে যেভাবে ভাবাতে চান সেভাবেই সে ভাবতে চায়। তবুও কেন যেন উৎকণ্ঠার একটা সুতীক্ষ্ণ কাঁটা নিরন্তর তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তার একমাত্র আশ্রয় তার মা. কোথায় হারিয়ে গেল সে?

সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত অকারণেই একটা তীব্র অভিমানবোধ তাকে অস্থির করে তোলে। কার পরে, কেন এই অভিমান? উত্তর

খোঁজে রুক্মিণী। সঠিক উত্তর খুঁজে না পেয়ে জীবনটাকে তার অভিশপ্ত বলে মনে হয়।

কিন্তু ভাবনার তার পরিসমাপ্তি ঘটে না। সেই একই কেন্দ্রে, চিন্তার সূত্রগুলো পাক খায়। সব সত্য যে, ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তিনি। তিলার্ধ বিশ্রামের সময়ও তাঁর নেই। তবু সপ্তাহকালের মধ্যেও ছিন্নমূল রুক্মিণীর কথা একবারের জন্য তাঁর মনে পড়ে না? তবে কেন মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া? কি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে তার দিন কাটছে—একথা কি তাঁর স্মরণপথে একবারের জন্যও উদয় হয় না?

কার জন্য উৎকণ্ঠা? শুধুমাত্র মায়ের সংবাদের জন্যই কি? নিজেকে নিজেই সহস্রবার প্রশ্ন করে রুক্মিণী। ধীরে ধীরে মায়ের মুখের আদল রূপান্তরিত হয়ে যায় অন্য একটি মুখাবয়বে, ভালো করে দেখা হয়নি সেই মুখ। সপ্তাহকাল পূর্বে প্রদীপের ভগ্ন আলোকে চকিতির জন্যই দেখার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু বার বার সেই মুখ তার হৃদয় পটে ভেসে ওঠে কেন?

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে রুক্মিণী। কেন যেন চোখের দুকূল ছাপিয়ে অবাধ্য অশ্রু নেমে আসে।

বার বার ঘুরে ঘুরে সেই অভিশপ্ত রাতটার কথাই মনে পড়ে। এক চিন্তা তার দিনের বিশ্রাম, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সেই চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তে যদি তার আগমন না ঘটত? এতদিনে কোন্ দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হত তাকে কে জানে?

ভয়ের সুতীব্র অনুভূতি এখনও তার দেহের প্রতি কোষে কোষে শিউরে ওঠে।

এরপরই রুক্মিণীর মনে চিন্তার গতি হঠাৎ বঙ্কিম পথে চলতে শুরু করে। এই অভিশপ্ত রাতটা যদি তার জীবনে না আসত তাহলে

তার গর্ভ থেকে জাত আর এক দুর্লভ প্রাপ্তির স্বাদ থেকেও তো সে বঞ্চিত থাকত।

অতর্কিতে ভিন্নতর অনুভূতির আস্বাদন রুক্মিণীর সমস্ত মনকে যেন রাঙিয়ে দেয়। এক চরম সুখানভূতির স্পর্শ দেহের প্রতি তন্ত্রীতে রোমাঞ্চ শিহর জাগায়।

তার জীবনে সে হল প্রথম পুরুষ-স্পর্শ। কি অযাচিত সৌভাগ্য তার! সমগ্র দোয়াবের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বপ্নের নায়ক ইন্দ্র-নাথের দুই পরুষ হস্তের আলিঙ্গনের মধ্যে সে কিনা জীবনে নারীত্বের প্রথম পাঠ নিল?

রুক্মিণী ভাবে, সেদিন ঘটনার আকস্মিকতায় শরীরের অনুভূতি-বাহক ইন্দ্রিয়গুলো যদি অতটা অসাড় হয়ে না থাকত তবে সেদিনের হৃদয়ভার সে বহন করত কি করে?

এভাবে শতবার এক কথাই ভাবে রুক্মিণী। অবশ্য তার শান্ত মুখশ্রীতে হৃদয়ের উদ্বেলতা ধরা পড়ে না।

মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের চিন্তাও বিব্রত করে রুক্মিণীকে। নিতান্ত সাময়িকভাবেই তার স্থান হয়েছে বৃদ্ধ নরোত্তমের গৃহে। কিন্তু এই নিরাপত্তা কদিনের? ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্য কোন্ বিধান লেখা আছে কে জানে? একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষিনী মা তার, তিনিও জীবিত আছেন কি না, থাকলে কি অবস্থায় কোথায় আছেন—সে সংবাদটুকুও অজানা তার কাছে।

রুক্মিণী অসহায়। পরিস্থিতির হাতে ক্রীড়নক সে। দুঃসহ প্রতীক্ষায় কাল যাপন করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই।

কিন্তু এই পৃথিবীতে অমোঘ নিয়মেই রাতের শেষে দিন আসে, পুরানো বছরের শেষে আসে নূতন বছর। সব প্রতীক্ষাই একদিন সুখে দুঃখে অবসিত হয়। অহল্যাও একদিন শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে

ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল।

রুক্মিণীর অহল্যা-প্রতীক্ষা শেষ হয় অষ্টম দিবসে। দিনান্তে সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তে অস্তগত-প্রায় ঘূর্ণিঝড়ের মতো ইন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হয় নরোত্তমের গৃহে। ধূলিধূসর রুক্ষ চুল, মুখাবয়বে ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন, ছ'চোখে শাণিত দৃষ্টি।

বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় না করে নরোত্তমকে স্থানান্তরে ডেকে নেয় সে। ছ'জনের দীর্ঘ শলাপরামর্শ চলে।

অন্তরাল থেকে সবই লক্ষ্য করে রুক্মিণী। উৎকণ্ঠায় তার হৃদয় যেন ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়। কিন্তু কিছুই তার শ্রুতিগোচর হয় না। অজানিত আশঙ্কায় বার বার তার অন্তর কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেন এই গোপনতা? তার মায়ের কোন্ দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে ইন্দ্রনাথ?

দীর্ঘ আলাপের পর নরোত্তম উঠে আসেন। পরম স্নেহে রুক্মিণীকে বলেন, চল মা উনি তোমাকে ডকছেন।

ইন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রুক্মিণীর সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে আসে। কিছুতেই ইন্দ্রের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। লজ্জা-সংকোচ-উৎকণ্ঠায় তার হৃদয় যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়।

ইন্দ্র কথা বলে, রুক্মিনী, তোমার মায়ের সংবাদ এখনও সঠিকভাবে জানতে পারি নি আমি। কিন্তু এই আশ্বাস দিতে পারি যে তিনি জীবিত আছেন।

—কিভাবে এই আশ্বাস দিচ্ছেন?

—সেদিন অন্ধকার রাতে সে যেদিকে পারে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। তারপর অনেকেই বনেজঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং এই অবস্থায় কারো সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ।

—আপনি আমায় মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন না তো?

প্রশ্ন করেই রুক্মিণী চকিতে একবার চোখ তুলে তাকায়। তৎক্ষণাৎ দুজনের দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে সংঘর্ষ হয়। সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণী দৃষ্টি আনত করে ফেলে। কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেতে মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। সে নিঃসংশয়ে বোঝে এই ব্যক্তিত্বের মানুষ মিথ্যাভাষণ উচ্চারণ করে না।

এরপর সামান্য কিছু সময় দুজনেই যেন ভাষা খুঁজে ফেরে।

অবশেষে ইন্দ্রনাথ কথা বলে, রুক্মিণী, তোমার জানা দরকার, এই গৃহও তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।

—কেন?

—গোপন সূত্রে খবর এসেছে, কর-সংগ্রাহকদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল বরণ; সুতরাং যে কোন মুহূর্তেই ওদের উদ্যত খড়্গ নেমে আসবে এই জনপদের উপর। কিন্তু এবার ওদেরও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। সম্পূর্ণ না হলেও এখানকার প্রজারা অনেকখানিই প্রস্তুত। মন তাদের তৈরী। সুতরাং সংঘর্ষও অনিবার্য। তাই এই স্থান তোমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।

—আমার কি করণীয়?

—তোমার অন্য কোন নিকট আত্মীয় কেউ আছেন কি যার কাছে তোমাকে আপাতত স্থানান্তরিত করা সম্ভব।

—আমার একমাত্র নিকট আত্মীয় আমার মাতা, তার কোন খোঁজ আমি জানি না। এছাড়া আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।

—কেন?

—তিনি দেশান্তরিত। কয়েকবৎসর পূর্ব তিনি কোন গর্হিত কার্যের

ফলে রাজরোষে পড়েন। তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। তখন তিনি নিজধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জীবন রক্ষা পায়। তারপর থেকে যতদূর জানি তিনি সুলতানী দরবারে বাণিকের কাজে ব্যপৃত আছেন।

—এছাড়া অন্য কোন আপন জন?

—হু একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়জন আছেন হয়তো। কিন্তু আমাকে দুর্বৃত্তেরা হরণ করেছিল একথা জানার পরও কে আমাকে আশ্রয় দেবে?

ইন্দ্র অনুমান করতে পারে সমস্যাটা যথেষ্ট জটিল। গভীর চিন্তার মধ্যে ক্ষণকালের মধ্যে ডুবে যায় সে। গভীর ভ্রূকুটি থমকে থাকে প্রশস্ত কপালে; এই ছিন্নমূল কিশোরীর বোঝা এখন যথেষ্ট ভারী মনে হয়

নরোত্তমও সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন মর্মে মর্মে। সমাধানের একটা সূত্র ধরে দেবার জন্যই যেন বলে ওঠেন, রুক্মিণী মা তো আমাদের সঙ্গেই যেতে পারে। আমাদের মেয়ে আমাদের সঙ্গেই চলুক না। সকলের একই গতি হোক।

—হ্যাঁ তা পারে; কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না। আপনারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেখানে নিরাপদ রুক্মিণী সঙ্গে থাকলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। ও কিশোরী এবং ওর সবচেয়ে বড় শত্রু ওর সম্মোহনী সৌন্দর্য—একথা তো মানেন?

বৃদ্ধ নরোত্তম ইন্দ্রনাথের যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করতে পারেন না। রুক্মিনী সত্যই অনুপম রূপবতী। তাই তিনি নিশ্চুপ থাকেন।

ক্ষণকাল পরে অন্দরমহল থেকে ইঙ্গিত পেয়ে স্থানত্যাগ করেন বৃদ্ধ।

উদ্দেশ্য তাঁর পরিষ্কার। সমস্যা যাদের তারাই সমাধান সূত্র আবিষ্কার করে নিক্। তিনি এই ঘটনা প্রবাহে বাইরের লোক বই নন। ইন্দ্রনাথ চিন্তার অতল গহনে ডুবে থাকে।

রুক্মিণীর অন্তরে কিন্তু উত্তেজনার দলমাদল বাজতে থাকে। সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই এই মানুষ তার রূপের প্রশংসা করেছে তা ঠিক, কিন্তু এও ঠিক যে তার মোহিনীমূর্তি এর চোখে পড়েছে। হলই বা তার রূপের প্রশংসা ইন্দ্রনাথের অন্তরের সহজ স্বীকৃতি।

তাই রুক্মিণীর হৃদয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। নারীজীবনকে মনে হয় ধন্য, সমস্ত জগৎ যেন মোহময়। একটা দুর্বার আবেগে উচ্ছ্বাস তার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে ওঠে।

কিন্তু যখন কথা বলে তখন কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাসের স্পর্শও লাগতে দেয় না রুক্মিনী। অতি সংযত কণ্ঠে বলে, আমার বোঝাটা আপনার কাছে ভীষণ ভারী বোধ হচ্ছে অনুমান করতে পারি। অনুমতি দিন, আমার ভাগ্য নিয়ে যে দিকে দুচোখ যায় আমি চলে যাই।

ইন্দ্র এই প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে তাকায় রুক্মিণীর দিকে। তার মুখের রেখায় রেখায় কি যেন অন্বেষণ করে। যত অপরিণত বলে মনে হয়েছিল রুক্মিণী তো তা নয়। আকারে এখনও কিশোরীই বটে কিন্তু নারীত্বে জাগরণ ঘটে গেছে ইতোপূর্বেই। না হলে এত পরিপাটি করে কথা বলে কেমন করে?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই প্রশ্ন করে ইন্দ্র, ভাগ্য তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে বলে মনে কর রুক্মিণীবাঈ?

—আমার মন্দভাগ্য নিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?

তীক্ষ্ণ শোনায় রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর। সে বকে চলে, আমার ভাগ্য আমাকে সর্বনাশের শেষ কিনারা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। তাই আমার ভাগ্যে ঘটতও যদি না সেই পরমমুহূর্তে আমাকে আপনি রক্ষা করতেন। আর সে কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার জীবন দিয়েও আমি শোধ করতে রাজী। মন্দভাগ্য হলে আবারও সে ঘটনার পুর্বানুবৃত্তি ঘটতে পারে। ঘটে ঘটুক। কিন্তু তবু আপনার কাছে আমি দুর্ভার বোঝা হয়ে উঠতে চাই না। আমি কারো করুণার প্রার্থিনী নই।

ইন্দ্র রুক্মিণীর কথা শুনতে শুনতে পরম বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। তার কণ্ঠস্বরের আবেগ অভিমান-বেদনা মিলেমিশে ইন্দ্রকে যেন অভিভূত করে ফেলে। শেষে হারানো কথার সূত্র ধরে বলে, রুক্মিণী, আমার কথায় তুমি হয়ত আহত হয়েছ, কিন্তু তোমাকে ব্যথা দেবার জন্য আমি এ প্রশ্ন করি নি। আমাকে ভুল বুঝ না।

প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলে না রুক্মিণী। কিন্তু তার নারীসত্তার গভীরে এক নবতর চেতনার সুরঝংকার সে শুনতে পায়। উদগ্র পৌরুষের প্রতিমূর্তি ইন্দ্রনাথ এইমাত্র যা উচ্চারণ করল তা তো পক্ষান্তরে যেচে হার মেনে নেবারই স্বীকৃতি। এর থেকে রমণীর প্রাপ্তি আর কি হতে পারে তার জীবনে?

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ইন্দ্র সরব হয়, তোমার দায়িত্বভার নেবার মতো নিকট-আত্মীয় যখন কেউ নেই এবং এ গৃহও যখন আর তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়, তখন আমার জায়গীর ধাত্রীগড়েই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তুমি অনেকখানি নিরাপদ। কারণ করসংগ্রাহকেরা যতই দুঃসাহসিক হোক সিংহের গুহায় তারা সহজে পা দেবে না। তাছাড়া দিল্লী থেকে তার দূরত্বও আর একটা

গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তবেই তাদের সেখানে পৌঁছতে হবে। এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ?

ইন্দ্রের বক্তব্য শুনতে শুনতে দুর্বার উচ্ছ্বাসে রুক্মিণীর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসতে থাকে। একটু আগেই ভাগ্যের কথা হচ্ছিল। তার ভাগ্য তাকে নিয়ে কোথায় চলেছে কে অনুমান করবে।

তবু আশ্চর্য ক্ষমতায় নিজেকে সংযত করে রুক্মিনী। পরে স্মিত কণ্ঠে বলে, এ বিষয়ে আপনার যা অভিরুচি তাই করবেন। আমার মতামতের মূল্য কি ? আমি শুধু এটুকুই জানি যা আপনি করবেন আমার শুভার্থেই করবেন। কথা শেষ করে এই প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে সে। দেখে ইন্দ্রনাথের দুই ব্যাকুল চোখও তার দিকেই নিবদ্ধ।

বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না রুক্মিণী। তবু সেই ক্ষণকালের মধ্যেই ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নূতনতর অনুসন্ধিৎসার ছায়া অভ্রান্তভাবেই পাঠ করে সে।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার আগে বলে, তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় প্রস্তুত হয়ে থেকো, আমি ইতোমধ্যে পাল্কীর ব্যবস্থা করে রাখব।

রুক্মিণী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় শুধু।

(নয়)

ইন্দ্রের অনুমান যে কতখানি অভ্রান্ত পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়।

হৃদয়হীন করসংগ্রাহকের দল ধূমকেতুর মতো বরণে এসে উপস্থিত হয় এবং রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে এই জনপদের বুকের উপর পাষাণভারের মতো চেপে বসে। যে পরিমাণ রাজস্ব তারা দাবী করতে থাকে অবশ্যই সুলতান-ঘোষিত করের তুলনায় তা কয়েক গুণ বেশী।

জনপদের মানুষ দলে দলে তাদের অক্ষমতা জানিয়ে কর মকুবের প্রার্থনা নিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু সবটাই বৃথা, সেই আকুল আবেদন রাজকর্মচারিবৃন্দের প্রস্তরবৎ হৃদয়গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে শুধু।

হয় কর পরিশোধ কর নয় যথাসর্বস্ব তাদের লোলুপ গ্রাসে তুলে দাও—একটা মাত্র নীতি মেনে চলে করসংগ্রাহকের দল। শিকারী বাজের তৎপরতায় প্রত্যেকের শেষ সম্বলটুকুও খুঁটে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওরা। কিন্তু যাদের লোভ সর্বগ্রাসী এতটুকু আহুতিতে তাদের ক্ষুধা তৃপ্ত হবে কেন? সুতরাং অনিবার্যভাবেই এই জনপদের উপরও নেমে আসে অত্যাচারের ক্ষুধিত তৎপরতা।

করসংগ্রাহকদের আচরণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে করসংগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সুলতানী পরোয়াণার জোরে নিরীহ প্রজাদের

উপর নানাবিধ পাশাবিক অত্যাচারের উন্মাদনা আস্বাদন করাতেই ওদের অধিকতর আগ্রহ।

কিন্তু এই প্রথম ভিন্নতর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় করসংগ্রাহকদের। এ কেমন করে সম্ভব যে এই ক্লীব মানুষগুলোও প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে? কিম্বা বলা উচিত প্রতিবাদের ঝড় তোলে?

করসংগ্রাহকদের নীল রক্তে আগুন ধরে যায়। অসহনীয় রায়ত প্রজাদের এই দুঃসাহস। এ তো বিদ্রোহের পূর্বাভাস। এখনি একে দমন না করতে পারলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

এমন শাস্তি তাই এই মানুষগুলোকে দিতে হবে যাতে অন্যান্য জনপদের মানুষ আর প্রতিবাদী হতে সাহসী না হয়।

কিন্তু এবারেও তাদের হিসাব মেলে না।

প্রতিবাদেই প্রজারা থেমে থাকে না; অস্ত্রের আস্ফালন রুখে দেয় অস্ত্র দিয়েই। বস্তুতঃ একটা খণ্ডযুদ্ধই ঘটে যায় এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের ঘটনা হত্যাহতের সংখ্যা হয় দু'পক্ষেই প্রায় সমান-সমান।

ঝড়ের মুখে স্ফুলিঙ্গের মত তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ে এই দুঃসংবাদ।

গুপ্তচরদের মুখে মুখে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর তখ্‌তে আসীন সাম্রাজ্যের কর্ণধার মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের কান পর্যন্ত পৌঁছাতেও বিলম্ব হয় না। প্রস্তরবৎ কাঠিন্যের সঙ্গে তিনি দিওয়ান-ই-ইনশার মুখ থেকে এই অবিশ্বাস্য সংবাদ শ্রবণ করেন। ভয়াল-ভীষণ ভ্রূকুটি উদ্যত হয়ে থাকে তার উন্নতকপালে।

কিছুক্ষণ সময় যেন সংবাদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতেই কেটে যায়। তাঁর শাসনে বিদ্রোহ, তাও প্রায় তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই। এ কি করে সম্ভব!

অতঃপর অগ্নিগর্ভ বজ্রের মতো ফেটে পড়েন সুলতান। এত

দুঃসাহস রায়ত প্রজাদের! সঙ্গে সঙ্গে উজীর, দিওয়ান-ই-আরিজ এবং বারিদ-ই-মামালিকের উদ্দেশ্যে জরুরী তলব পাঠানো হয়। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন ছুটে আসেন।

তৎক্ষণাৎ চার প্রধান রাজকর্মচারী এবং সুলতানের উপস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরী এবং গোপন বৈঠক বসে। দিওয়ান ই-আরিজের উদ্দেশ্য প্রশ্ন বর্ষিত হয় সুলতানের কণ্ঠ থেকে, বিদ্রোহের প্রকৃত অবস্থা কি? এ বিষয়ে আপনি কতটুকু জানেন?

উত্তর দিতে গিয়ে শঙ্কায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে দিওয়ান ই-আরিজের। কম্পিত কণ্ঠে বলেন, চরের মুখে যতখানি সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় বিচ্ছিন্নভাবে জনপদে জনপদে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

—কর আদায় করতে গিয়ে অনেক রাজকর্মচারী হতাহত হয়েছে এ সংবাদ কি সত্য?

—সত্য।

—কিন্তু বিদ্রোহ করবার মতো এত বিপুল সাহস দোয়াবের প্রজারা সংগ্রহ করল কিভাবে?

সুলতানের এ প্রশ্নের জবাব দেন বারিদ-ই-মামালিক। বিব্রত কণ্ঠে বলেন, অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে একটিমাত্র মানুষই সমস্ত প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের মূলে ইন্ধন যোগান দিচ্ছে।

—একটি মাত্র মানুষ? হিন্দু না মুসলমান?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা, একজন হিন্দু যুবাপুরুষ।

—কিন্তু কে সে? কি তার পরিচয়?

এবারও প্রশ্নের উত্তর আসে বারিক-ই-মামালিকের পক্ষ থেকেই। তিনি বলেন, এই যুবকের নাম ইন্দ্রনাথ। দোয়াবের দক্ষিণখণ্ডে ধাত্রীগড় তার জায়গীর।

—ধাত্রীগড়? সুলতানের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ ধাত্রীগড়; আপনি স্মরণ করতে পারবেন এর পিতা মহেন্দ্রনাথ আপনার মহামান্য পিতার প্রিয় সুহৃদ এবং বয়স্য ছিলেন। মোঙ্গলদের সঙ্গে সীমান্তযুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

—মহেন্দ্রনাথের পুত্র। হ্যাঁ তাঁর নাম আমার পরিষ্কার স্মরণে আছে।

দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং রাজনীতিক ছিলেন। প্রকৃত পুরুষসিংহ। কিন্তু তাঁর পুত্রের এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ কি? সে কি চায়?

সুলতানের এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু উপস্থিত মন্ত্রীদের কারো মুখ থেকেই পাওয়া যায় না। সকলেই নিরুত্তর থাকেন।

—আশ্চর্য! আমার শাসনযন্ত্রের যারা মূল শক্তি তাদের বুদ্ধির অসারতা দেখে আমি সত্যই স্তম্ভিত।

সুলতানের ব্যঙ্গোক্তি তীক্ষ্ণফলা অস্ত্রের মতোই মন্ত্রীদের বুকে গিয়ে বেঁধে, কিন্তু প্রতিবাদের একটি কথাও তাঁরা উচ্চারণ করতে পারেন না।

অস্বস্তিকর নীরবতা আবার সুলতানের কণ্ঠস্বরেই ভঙ্গ হয়। অনুচ্চ অথচ পুরুষ কঠিন কণ্ঠ শোনা যায়, দিওয়ান-ই-আরিজ?

—আদেশ করুণ খোদাবন্দ্।

—এই বিদ্রোহ দমনের সমস্ত দায়িত্ব আমি আপনার উপরই ন্যস্ত করলাম। যতশীঘ্র সম্ভব এবং যে কোন পথে এ কাজ আপনাকে সম্পাদন করতে হবে। অবশ্য একটা কথা মনে রাখবেন, প্রজাদের ক্ষয়ক্ষতি যত কম হয় ততই মঙ্গল। অযথা লোকক্ষয় আমার পছন্দ নয়। ধ্বংসস্তূপের উপর বসে রাজত্ব করা যায় না।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপনার প্রথম কাজ হবে এই বিদ্রোহের নায়ককে বন্দী করা। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, জীবিত এবং অক্ষত অবস্থায়। আমি একবার তার মুখোমুখি হতে চাই। শেরের বাচ্চা শের না শৃগাল দেখতে চাই।

—আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে জাঁহাপনা।

—হ্যাঁ, তাই যেন হয়। এখনকার মতো আপনারা বিদায় নিতে পারেন।

সুলতানকে আভূমি কুর্নিশ জানিয়ে মন্ত্রীরা একে একে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু যাবার পূর্বমুহূর্তে প্রত্যেকেই চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করেন সুলতানের মুখমণ্ডলে এক অব্যাখ্যাত হাসির রেশ ফুটে আছে। তিনি যেন বাস্তব জগতের পরিমণ্ডল ছেড়ে এক স্বপ্নের জগতে চলে গেছেন।

শেরের ঘরে যে শেরই জন্মায়, শৃগাল নয়, দু'একদিনের মধ্যেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হয় দিওয়ান-ই-আরিজকে। বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি দেখে রীতিমতো চিন্তান্বিত হন তিনি। কোন্ যাদুমন্ত্রে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন প্রজারা এমনভাবে একাত্ম হয়ে গিয়ে দুর্জয় প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলল অবাক বিস্ময়ে ভাবেন সে কথা। শুধু দুশ্চিন্তা নয় ধীরে ধীরে আশঙ্কা গ্রাস করতে থাকে তাঁর হৃদয়কে।

দিওয়ান-ই-আরিজ বিচক্ষণ সেনানায়ক। দোয়াবের মাটিতে পা রেখেই বিপদের সংকেত পেয়েছেন তিনি। দূর থেকে বিদ্রোহকে দমন করা যত সহজসাধ্য মনে হয়েছিল অভ্রান্তভাবেই অনুমান করেছেন কাজটা তার তুলনায় বহুলাংশে দুরূহ।

কোথাকার আগুন নির্বাপিত করবেন? আগুনের অস্তিত্বটা কোথায়

তাই তো তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন না। কিন্তু তার আঁচ গায়ে এসে লাগছে ঠিকই।

আরো কথা আছে। কার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন তিনি যেমন জানেন না, তেমনি সৈন্যরাও সে বিষয়ে একেবারেই অবহিত নয়। তাদের মধ্যে তাই অলক্ষিত ভীতি সংক্রামিত হয়েছে। এতদিন তারা নিশ্চিন্ত ছিল প্রতিপক্ষ শুধু মরতেই জানে। কিন্তু এখন জেনেছে প্রতিপক্ষ মার দিতেও জানে। আবার সে মার কোন্ অলক্ষিত পথে আসবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

দিওয়ান-ই-আরিজ বুঝতে পেরেছেন সম্মুখ যুদ্ধে বিদ্রোহীরা কখনো ধরা দেবে না। ওরা আসবে রাতের অন্ধকারে অলক্ষ্যে এবং পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। ক্ষয়ক্ষতি যা করবার করে নিঃশব্দে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করবে

বস্তুতঃ তাঁর চোখের উপরই ঘটনার গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে থাকে। হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে তার পক্ষে। অথচ প্রতিপক্ষের কোন হদিশ পাচ্ছেন না তিনি। মাঝে মাঝেই তাঁবুতে তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বিদ্রোহীরা। কোন প্রতিকার করবার আগেই ঘটে যাচ্ছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। প্রচুর পাহারাদারির ব্যবস্থা রেখেও এর ব্যতিক্রম ঘটানো যায় নি।

গভীর দুশ্চিন্তার অজস্র কুটিল রেখা দিওয়ান-ই-আরিজের কপালের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠতে থাকে। অনেকগুলো দিনই তো অতিবাহিত হয়ে গেল। বিদ্রোহ দমন করা তো দূরের কথা, সামান্য প্রতিকার পর্যন্ত তিনি করে উঠতে পারেন নি। বরং উত্তর দিক থেকে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন বাধার পাহাড়টা ততই উত্তুঙ্গ বলে মনে হচ্ছে।

দিওয়ান-ই-আরিজের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাবনা সেই মানুষটাকে নিয়ে যে সব প্রতিরোধের মূল নিয়ন্ত্রণী শক্তি। চতুর্দ্দিকেই তার অমোঘ উপস্থিতি, কিন্তু সে আশ্চর্য কৌশলে সমস্ত ধরাছোঁয়ার জালের বাইরে।

সৈন্যদের মধ্যেও ক্রমশঃ বাসা বাঁধছে হতাশা বোধ। একই সঙ্গে দ্বিমুখী প্রতিরোধের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে তাদের। বিদ্রোহীদের অতর্কিত দুর্বার আক্রমণ-সম্ভাবনা তো আছেই, সঙ্গে দুর্নিবার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। নিদারুণ জলকষ্ট চতুর্দ্দিকে। জলাভাবে সকলের উন্মত্ত হবার অবস্থা।

সুতরাং নানা দিক থেকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে পদক্ষেপ করতে হয় দিওয়ান-ই-আরিজকে। অনেক যুদ্ধ করেছেন জীবনে, মৃত্যুর হাতছানি দেখেছেন বহুবার। কিন্তু এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে কোনদিন ইতোপূর্বে পড়েছেন বলে মনে করতে পারেন না। এখুনি জনপদের পর জনপদ তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন ; শ্মশান করে দিতে পারেন সমগ্র দোয়াবকে কিন্তু সুলতানের সাবধানবাণী তাকে সে কার্যে বাধা দিচ্ছে। সত্যই তো ধ্বংস স্তূপের উপর বসে রাজত্ব করা চলে না। তাছাড়া বিশ্বাস কি খেয়ালী সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলককে ? তার মাত্রাজ্ঞানের সঙ্গে অন্য কারো মাত্রাজ্ঞান মেলে না। কোন্ কাজের জন্য ভবিষ্যতে কোন্ শাস্তি তোলা থাকবে কে বলতে পারে ?

কিন্তু আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও তো সম্ভব নয়। যেমনভাবে হোক্ এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া দরকার। আর তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইন্দ্রনাথকে বন্দী করা এবং সুলতানের নির্দ্দেশানুযায়ী সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়।

কিন্তু সুলতানের এই নির্দেশ যথাযথ ভাবে মানতে গিয়ে দিওয়ান-ই-আরিজকে কি কম খেসারত দিতে হচ্ছে? আসলে বাঘ নিয়ে খেলবার ইচ্ছা সুলতানের। কিন্তু তার জন্য মত মূল্য দিতে হচ্ছে তাকে। হতাশায়, দুশ্চিন্তায় একেবারে যেন ভেঙে পড়েন দিওয়ান-ই-আরিজ। জীবনহানির আশঙ্কাও যে মাঝে মাঝে মনের গভীরে উঁকিঝুকি মারে না এমন নয়।

এমনি মানসিক চূড়ান্ত দোলাচলতার মধ্যে অকস্মাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই একটা সুযোগ এসে যায় দিওয়ান-ই-আরিজের হাতে। সুবর্ণ সুযোগই একে বলা উচিত হয় তো এবং শেষ সুযোগও। রাতের অন্ধকারে সৈনা শিবিরে অগ্নি সংযোগ করে পালিয়ে যাবার মুখে তিনজন বিদ্রোহী অকস্মাৎ ধরা পড়ে যায় টহলদারী সৈন্যদের হাতে। তাদের হত্যা না করে তারা হাজির করে সেনা নায়কের সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেন দিওয়ান-ই-আরিজ। ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে তাঁর অধরে। চরম সুযোগ এসে যখন উপস্থিত হয়েছে নিতান্ত অযাচিত ভাবেই তখন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তাঁকে করতেই হবে। তাঁর চিন্তার গতি কুটিল পথে বাঁক নেয়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন, রাজদ্রোহিতার শাস্তি জান?

যাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তারা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বাক থাকে।

—তোমাদের শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু সাধারণ মৃত্যু নয়; জীবন্ত অবস্থায় তোমাদের শরীরের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হবে।

বিদ্রোহীরা এতদ্‌সত্ত্বেও একটি কথা উচ্চারণ করে না।

কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহরে ঘাতকের শাণিত ছুরিকা যখন প্রখর রৌদ্রে ঝলসিত হয়ে ওঠে তখন ওদের কণ্ঠে কথা ফোটে।

ফুটবে যে সে কথা দিওয়ান-ই-আরিজের চেয়ে ভালো কে জানে? মৃত্যু তো জীবনের শেষতম পরিণামই, কিন্তু তাই বলে এই ভীষণ জীবনান্ত! বন্দীদের চোখে ভয়ের চকিত ছায়া লক্ষ্য করেন সেনা-নায়ক।

দিওয়ান-ই-আরিজের চোখের কোণে ক্রূর হাসি ঝলসে ওঠে। সফল হতে চলেছে তাঁর অভিপ্রায়। বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি মুক্তি চাও অথবা মৃত্যু?

—মুক্তি চাই।

—দিতে পারি, কিন্তু একটিমাত্র শর্তে।

—বলুন হুজুর।

—বিদ্রোহের নায়ক ইন্দ্রনাথকে আজ রাত্রে কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্ভুল খবর চাই। দিতে রাজী আছ?

একদিকে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে কর্তব্যবুদ্ধি, দু'য়ের টানাপোড়েনে আন্দোলিত হতে থাকে তিনটি অভিশপ্ত মানুষ। অবশেষে মৃত্যু-ভয়ই জয়যুক্ত হয়। তিনজনের মধ্যে একজন বলে ওঠে, হুজুর, আমরা সব গোপন খবরই ফাঁস করে দিতে রাজী আছি।

—বেশ তাহলে বল, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?

—রুদ্রদেবের গড়ে আজ রাত্রির দ্বিতীয় যামে।

—সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে বলছ। সেখানে সে আসবে কেন?

—সেখানেই বিদ্রোহীদের আজ রাত্রে সমবেত হওয়ার কথা।

উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিওয়ান-ই-আরিজের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে অতঃপর আবর্তিত হতে থাকে একটি মাত্র নাম, রুদ্রদেবের গড়।

* * * * *

সেদিন নৈশ অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রগড়ের চতুর্দ্দিকে পাঁচসহস্র সৈন্যের অলক্ষিত ব্যূহ রচনা করে ফেলেন দিওয়ান-ই-আরিজ। তাঁর উদ্দেশ্য সেই ব্যূহ ভেদ করে একটি বিদ্রোহীও যাতে পলায়ন করতে না পারে। এক সুযোগেই তিনি বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সহ বাকী সকলকেও করায়ত্ত করবেন, সমস্ত প্রতি-রোধের মেরুদণ্ডকে চূর্ণ করে ফেলবেন বলেই তিনি বদ্ধ পরিকর।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় কালতিপাত হতে থাকে। প্রতিটি খণ্ড মুহূর্তও যেন দীর্ঘায়িত হয়ে পড়েছে। প্রহর যেন যুগান্তরের মতোই দীর্ঘস্থায়ী। সময় যেন অনন্ত। তবু অনিবার্যভাবেই একসময় রাত্রির অন্ধকার ক্রমে তরল হতে থাকে। চারদিকে প্রভাতের আগমন সংবাদ। এক রাত্রির অবসানে নতুন দিবসের শুভাগমন।

ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে দিওয়ান-ই-আরিজ যেন ফেটে পড়বেন। বান্দার বাচ্চাগুলো তাঁকে আগাগোড়া প্রতারিত করেছে। কঠিনতম শাস্তির কথা ভাবতে ভাবতে মূল শিবিরে সৈন্যদের ফেরার হুকুম দেন তিনি। কল্পনা করতে করতে চলেন কাফেরগুলোকে জ্যান্ত আগুনে ফেলে দেবেন। আর বাঁচার জন্য যখন তারা আকুল চিৎকার করবে সেই চিৎকার শুনতে শুনতে অন্তর্জ্বালা নির্বাপণ করবেন।

কিন্তু শিবিরে ফিরেই ভীষণতম দুঃসংবাদটি কর্ণগোচর হল সৈন্যা-ধ্যক্ষের। তাঁর অনুপস্থিতিতে গতরাত্রেই বিদ্রোহীদের এক বিশাল দল চড়াও হয় স্বল্পাবিশিষ্ট সৈন্যেদের উপর। নির্বিবাদে তারা অগ্নিসংযোগ করে শিবিরে-শিবিরে, লুঠপাঠ করে এবং অবশেষে বন্দীদের বন্ধনমুক্ত করে বিনাবাধায় বনান্তরালে আত্মগোপন করে।

দিওয়ান-ই-আরিজ বজ্রাহতের মতই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করেন।

নতুন করে আর একবার উপলব্ধি করেন তাঁর প্রতিপক্ষ শেরই ; কিন্তু একই সঙ্গে সে শৃগালের মতো ধূর্তও।

আত্মগ্লানিতে জীবন বিসর্জন দিতে ইচ্ছা হয় তাঁর। অস্বীকার করার উপায় নেই প্রতিপক্ষের কাছে তিনি সব বিষয়েই সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

(দশ)

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে.—এমতাবস্থায় নেতৃত্বের বোঝা ইন্দ্রনাথের বেশ ভারীই বোধ হতে থাকে। এখন প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে অত্যন্ত সাবধানে কারণ হিসাবের সামান্যতম ভুলচুক ভবিষ্যতের সকল স্বর্ণ-সম্ভাবনার সমাধিস্তূপ রচনা করতে পারে।

ইন্দ্র তাই অত্যন্ত সাবধানী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতিই তাকে সাবধানী হতে শেখায়। মর্মে মর্মে অনুধাবন করে পরবর্তী পর্যায়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই ইতিকর্তব্য স্থির করা উচিত কার্য হবে! গুপ্তচরদের মারফত দিকে দিকে তাই গোপন বার্তা পাঠিয়ে দেয়। সকলে এসে সমবেত হোক্ তার জায়গীর ধাত্রীগড়ে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা হবে তখনি সকলের অভিমত নিয়েই। বিদ্রোহের সমিধ যখন সংগৃহীত হয়েছে এবং অগ্নি যখন প্রস্তুত তখন সর্বাত্মক দাবানলই প্রজ্বলিত হোক্। তাতে সম্ভবতঃ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তবে পরিপূর্ণ অগ্নি-সম্ভাবনার পূর্বে একটা শুভ নিষ্পত্তিতে কোনভাবে পৌছানো যায় কি না, একবারও তার সন্ধান করা বাঞ্ছনীয়।

আর একটা দুশ্চিন্তাও নিরন্তর ইন্দ্রনাথকে বিব্রত করে। নিতান্তই দৈব-দুর্বিপাকে তার বন্ধনহীন জীবনে একটা ক্ষণিক বন্ধনসূত্র গড়ে উঠেছে। আর্তজনকে রক্ষা করার চিরন্তন মানবিক ধর্মের প্ররোচনায় একদিন নিশাকালে যে কিশোরীটিকে সে রক্ষা করেছিল তাকে

নিয়ে ধীরে ধীরে জটিলতার অদৃশ্য জাল তৈরী হচ্ছে। শুধু রক্ষা-কর্তার ভূমিকা নয় এখন আশ্রয়দাতার ভূমিকা পালন না করেও তার গত্যন্তর নেই। দু'একদিনে পরিস্থিতির যে দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটেছে তাতে রুক্মিণীর বিষয়ে দীর্ঘকালীন ভাবনা চিন্তার পরি-প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগই ছিল না। তাই উপায়ান্তর না থাকায় তাকে ধাত্রীগড়েই নিয়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু কেন যেন এ বিষয়ে মনের পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে না ইন্দ্রনাথ।

সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা হল নিজের হৃদয়কে নিয়েই। সেখানে নিরন্তর চলেছে দ্বন্দ্ব। যতই সে নিজের মনকে রুক্মিণীর প্রতি বিমুখ করে তোলবার চেষ্টা করছে ততই যেন সেখানে বাসা বাঁধছে স্নেহ-দয়া-মমতা। তাকে দেখলেই কেন যেন কারুণ্যে মনটা তার ভারী হয়ে ওঠে। রূঢ় কণ্ঠে কথা বলতে চেয়েও কোমল হয়ে আসে কণ্ঠস্বর।

ইন্দ্র বার বার মনকে বোঝাতে চায় কেন এই দুর্বলতা। চারদিকে যেভাবে সন্ধান চলছে, রুক্মিণীর মাকে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পাওয়া যাবেই। তখনই তো ছিন্ন হয়ে যাবে যোগসূত্র। আর সেটাই বাঞ্ছনীয়। তবে কেন এত স্নেহ-মায়া-মমতার জাল বোনা? ইন্দ্রের ঠোঁটের কোনে বিমর্ষ হাসি ফুটে ওঠে। গত দু'একদিনের মধ্যে রুক্মিণীকে মাত্র কয়েকবারই দেখেছে সে, তাও নিতান্ত খণ্ড-কালের জন্য, কথাবার্তাও প্রায় হয় নি বললেই চলে। তবু ইন্দ্র কেন যেন অনুভব করছে অদৃশ্য অবস্থান থেকে দুটি চোখ নিরন্তর তার দিকে দৃষ্টি রাখছে। তার জীবনযাত্রায় সামান্য হলেও কোথায় যেন একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে—এটাও তার অন্তরেন্দ্রিয় দিয়ে সে অনুভব করছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা চোখে পড়ছে ভীমের ক্ষেত্রে। যখনই তাকে চোখে পড়ছে দেখে

মনে হচ্ছে সে যেন খুশীর জোয়ারে ভাসছে। ইন্দ্রের বিস্ময় বোধ হয় রুক্মিণী কত অল্প সময়ের মধ্যেই না ভীমের হৃদয়ের আজন্ম সঞ্চিত পিতৃস্নেহের ভাণ্ডার লুট করে নিয়েছে।

এভাবেই অনিয়ন্ত্রিত চিন্তার স্রোতে ভেসে চলতে চায় ইন্দ্রের মন। কিন্তু সচেতন প্রয়াসে সে নিজেকে সংযত করে। সন্দেহ কি যে এই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে আছে আসন্নপ্রায় চরম বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে, এখন অলীক কল্পনার জাল বোনবার সময় নয়। এখন শুধুমাত্র কর্তব্য পালনের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে তোলবার সময়।

এক মুহূর্তে সমস্ত অলীক কল্পনাবিলাসকে ঝেড়ে ফেলে তাই সোজা দাঁড়ায় ইন্দ্র। রুক্ষ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। বহির্মহল ছেড়ে অন্দরমহলের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ যাত্রা করে।

পিতা মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিটি মহল। অথচ সবই বর্তমানে ইন্দ্রনাথের কাছে শূন্য মনে হয়। চতুর্দিকে দাসদাসী, প্রতিগ্রাহী, প্রতিপাল্যের সংখ্যাও কম নয়, তবু কেন যেন সকলের আচরণই নিষ্প্রাণ। একটা অভাবনীয় ভীতির অদৃশ্য নাগপাশে যেন সবাই বদ্ধ।

অন্দরমহলের প্রবেশ পথেই রুক্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় ইন্দ্রনাথের। নতমুখী রুক্মিণীর উদ্দেশ্যে বলে, খুব জরুরী কয়েকটি কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

—বলুন।

—আমার সঙ্গে এস। কথা ক'টি উচ্চারণ করে ইন্দ্রনাথ আগে আগে চলে, তাকে অনুসরণ করে রুক্মিণী।

সারিবদ্ধ কক্ষ, সুদীর্ঘ অলিন্দ শ্রেণী অতিক্রম করে দুজনে এসে উপস্থিত হয় সুরম্য উদ্যানে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাষাণপট্টের

একটিতে নিজে উপবেশন করে কাছাকাছি আর একটিতে রুক্মিণীকে বসার নির্দেশ দেয়। নিঃশব্দে ইন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী রুক্মিণী একটি পট্টের উপর উপবেশন করে।

স্বল্পক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দ্র সরব হয় ; বলে, তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করতে পারছি না। তাই সর্দ্দারকে বলেছি সবদিকে নজর রাখতে। আশা করি তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ?

—জন্মাবধি এতখানি স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। আপনি অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না।

—আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এবার যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য তোমাকে একান্তে ডেকে এনেছি সেটা বলি। দু'একদিনের মধ্যেই সম্ভবতঃ জীবনমরণ সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে চলেছি আমি। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে অন্তিম পরিণামই আমাকে বরণ করতে হবে। আর সে কারণে তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমাকে ভাবতে হচ্ছে।

—আমি কি জানতে পারি কি সেই জীবন মরণ সংকট ?

—তা বিশেষ কারণে এখনই তোমাকে জানানো অসম্ভব।

—তাই যদি হয় তবে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমার ভূমিকা কি ?

ইন্দ্র আবারও অনুধাবন করে রুক্মিণী এমন চরিত্র যাকে চাইলেই অবহেলা করা যায় না। সে অনন্যা। কিন্তু তা বলে অন্তর্লীন চিন্তাধারাকেও তো এই কিশোরীর কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই বলে, তুমি বৃথাই অভিমান করছ। আসলে সে কথা জেনে তোমার কোন লাভ নেই।

—পৃথিবীর সবকিছু লাভালাভের হিসাব মেনে চলবে এমন কথা

আপনাকে কে বলল? আপনি যখন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমাকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তখন কোন লাভের হিসাব করেছিলেন? সমস্ত দোয়াবের মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে সুলতানের অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে এই যে বিদ্রোহ এর পিছনেই বা আপনার কোন্ লাভের হিসাব আছে বলবেন আমাকে?

মুগ্ধ বিস্ময়ে ইন্দ্রনাথ রুক্মিণীর দৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই কিশোরীর সম্বন্ধে তার সমস্ত পরিমাপ ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। কিশোরী বলে একে আর অবহেলা করা চলবে না কারণ পূর্ণ নারীত্বের ঘোষণা এর প্রতিটি অভিব্যক্তিতে।

দু-এক মুহূর্তের মধ্যে ইতিকর্তব্য স্থির করে নেয় ইন্দ্রনাথ। তারপর বলে, শোন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি একবার দিল্লী যাব। দিল্লীর মসনদে সমাসীন অভ্রংলিহ আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ সুলতানের মুখোমুখি দাঁড়াব একবার। জানতে চাইব দোয়াবের মানুষের অপরাধ কি? কেন তাদের উপর এই দুঃসহ নিপীড়ন? ইন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনতে শুনতে রুক্মিণীর হৃদয় উৎকণ্ঠার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, আশঙ্কায় শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। এই প্রথম আত্মবিস্মৃত হয়ে সে আর্ত চিৎকার করে ওঠে, না, কখনো না।

—কি না?

—আমি মিনতি করছি জীবনের বিনিময়ে এ ঝুঁকি আপনি নেবেন না। আপনার শুভাশুভ এখন আর শুধু আপনার একার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়। সারা দোয়াবের সব মানুষ আপনার মুখ চেয়ে আছে। আপনার কোন বিপদ হলে তাদের কি হবে? জেনে শুনে কেন সিংহের গুহায় পা দেবেন?

—রুক্মিণী, তোমার কথার পিছনে যুক্তি আছে মানছি। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে

না।

—আমি বাধা দেব।

—তুমি বাধা দেবে? কিভাবে?

—মনে রাখবেন, এই স্থান ত্যাগ করে দিল্লীযাত্রা করলে আমার মৃতদেহের উপর দিয়েই আপনাকে যেতে হবে। আমাকেও কেউ বাধা দিতে পারবে না।

—রুক্মিবাঈ!

—হ্যাঁ, যে প্রাণ একদিন আপনি আমাকে দান করেছেন তখন তা হরণ করার দায়ও আপনাকে বহন করতে হবে।

এত দৃঢ় প্রত্যয়েই কথাগুলি উচ্চারিত হয় রুক্মিণীর কণ্ঠ থেকে যে তাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথের মনে তিলমাত্র সংশয়ও জাগে না। সেই মুহূর্তেই অনুভব করে দুরধিগম্য জটিলতার জাল অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে। নিজেকে অনেকটা অসহায়ও বোধ হয়। তার কণ্ঠস্বরেও সেই অসাহায়ত্ব ধরা পড়ে অনেকখানি। বলে, তুমি এভাবে আমার সংকল্প থেকে আমাকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা কোরো না রুক্মিণী। একটা অবশ্যম্ভাবী সংঘাতকে যদি কৌশলে পাশ কাটানো সম্ভব হয় তার জন্য অন্ততঃ একবারও আমাকে সক্রিয় হতে দাও।

—কিন্তু তার জন্য বাজী রাখতে হবে কিনা নিজের জীবন? শ্লেষতীক্ষ্ণ শোনায় রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর।

—জীবন তো বাজী রেখেছি সেদিনই যেদিন এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এখন আর নতুন করে সে প্রসঙ্গ তোলার সার্থকতা কি?

—আপনি আবারও সার্থকতার প্রশ্ন তুললেন। একটু আগেই বলেছেন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

আপনার নিজের ভবিষ্যৎই যখন চূড়ান্ত অনিশ্চিত তখন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলারই বা কি সার্থকতা আমাকে বলবেন কি ?
—আমার নিজের ভবিষ্যৎ চরম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা বলেই তো বেশী করে তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আমার জীবনে যদি তেমন অশুভ কিছু ঘটেও তবুও ধাত্রীগড়ে তোমার অবস্থান যাতে পাকাপাকি হতে পারে তার ব্যবস্থাই করে যেতে চাই আমি।

—অর্থাৎ আপনার প্রতিপাল্যের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে চান ? এই তো ?

—এমন কথা মনে হল কেন তোমার ?

—এটা মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। অনেক দয়া দেখিয়েছেন আমাকে, এই শেষ দয়াটুকু থেকেও বঞ্চিত করতে চান না আমাকে।
—তুমি ভুল করছ, এতে দয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

—তা যদি না থাকে তবে আসে অধিকারের কথা। কি অধিকারে ধাত্রীগড়ে চিরকালের জন্য বাস করতে পারি আমি ? বলুন কি অধিকারে ? উদ্গত অশ্রু ঢেকে ফেলার জন্য মুখ নীচু করে নেয় রুক্মিণী।

তবু সেই চকিত অবসরেই ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি অভ্রান্তভাবেই পাঠ করে রুক্মিণীর মুখ ভাব ; আহত-অভিমান, অসহায়ত্বের বেদনা, নব-প্রস্ফুটিত নারীত্বের লাবণ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে অনির্বচনীয় সে মুখাবয়ব।

সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের গভীর-গহনে এক নবতর আবেগের দোলা অনুভব করে ইন্দ্রনাথ। তার সমগ্র চেতনাকে এক সুতীব্র আকর্ষণ বোধ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। সে মুহূর্তে উপলব্ধি করে এতদিন যে অনুভূতিকে সে স্নেহ বলে মনে করেছিল তা আসলে প্রেম।

এই তিলোত্তমা নারী তার বুভুক্ষু হৃদয়ের অন্তঃপুরে ইতোমধ্যেই সুদৃঢ় অধিকার দখল করে নিয়েছে।

আবেগ মথিত কণ্ঠে ইন্দ্রনাথ ডাকে, রুক্মিণীবাঈ।

—বলুন; সিক্তপক্ষ দুই বিশাল আঁখি তুলে সাড়া দেয় রুক্মিণী। ইন্দ্র বলে চলে, অধিকারের প্রশ্ন তুলে তুমি আমার মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। তা না হলে যে কথা এখন বলব তা আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না। তুমি সেই অধিকার নিয়েই ধাত্রী-গড়ে থাক যে অধিকারে একবার কোন গৃহে পদার্পণ করলে সে ঘর নারীর চিরকালের ঘর হয়ে ওঠে।···তুমি কি এ অধিকার গ্রহণে স্বীকৃত আছ রুক্মিণী?

ইন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনতে শুনতে দুর্দমনীয় আবেগে রুক্মিণীর সর্বাবয়ব রোমাঞ্চিত হতে থাকে। যা ছিল স্বপ্ন-সম্ভাবনারও অতীত তাই এখন তার করতলগত। কি রমণীয় এই প্রাপ্তি! নব-অর্জিত স্বাধিকারবোধের প্রমত্ত উল্লাস তার রমণী-হৃদয়কে দলিত-মথিত করে দেয় যেন! কণ্ঠে তার ভাষা ফোটে না। বিস্ফারিত চোখ মেলে সে তাকিয়েই থাকে শুধু।

—রুক্মিণী, তুমি কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দাও নি এখনও; ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেন আহত অভিমানের স্পর্শ ধরা পড়ে।

—আমার চোখের দিকে একবার তাকাও, তাহলেই তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবে, তাকাও আমার চোখের দিকে; অস্ফুট গদ গদ ভাষ ফোটে রুক্মিণীর কণ্ঠে।

ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি পরমুহূর্তেই আশ্লেষে আবদ্ধ হয়ে যায় রুক্মিণীর দৃষ্টির সঙ্গে। দু'জনের চোখের গভীরে দুজনে জীবনের ভাষা পাঠ করে।

অনন্ত সময় যেন অতিবাহিত হয়ে যায় তারপর। কেউই অযথা

কথা বলে জীবনমন্থনোদ্ভূত অমৃতাস্বাদনের অনুভূতিকে ভগ্ন করতে চায় না। দু'জনেরই মনে হয়, জীবনের এই লগ্ন যদি অক্ষয় হয় তবে তাই হোক।

অবশেষে রুক্মিণীর কণ্ঠস্বরে দীর্ঘক্ষণের মাদক-নীরবতা ভঙ্গ হয়। প্রত্যয়ী কণ্ঠে সে বলে, মনে রেখ, আজ থেকে তুমি অঙ্গীকারবদ্ধ হলে আমার কাছে; চিরকালের জন্য। এখন থেকে তুমি আমার, একান্তভাবেই আমার।

—আমি একথা চিরকাল মনে রাখব। রুক্মিণী, এতদিন আমার গৃহ ছিল, কিন্তু সেখানে দীপ জ্বালা হয়নি; এবার তুমি সেখানে মঙ্গলদীপ জ্বালাও।

—তাই হবে; আমাদের গৃহে এবার মঙ্গলদীপ জ্বলবে। পত্রমর্মরের মতোই কথাগুলি উচ্চারণ করে রুক্মিণী।

—অথচ নিয়তির কি আশ্চর্য পরিহাস দেখ, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে চলে ইন্দ্রনাথ, আমার জীবনের পরম প্রাপ্তির ক্ষণটি তখনই এল যখন কিনা জীবনের কঠোরতম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি। যে ব্রত আমি একবার গ্রহণ করেছি তা শেষ না করে জীবনকে উপভোগ করার আমার তো কোন অধিকার নেই।

—আমি তোমার কথার ইঙ্গিত ধরতে পেরেছি প্রিয়তম। শুধু নিজেরই সুখ চাইব এত স্বার্থপর আমি নই। তোমার কর্তব্যকর্মে তোমাকে আমি বাধা দেব না। সমগ্র দোয়াবের অগণিত প্রজা তোমার মুখ চেয়ে আছে; তাদের প্রত্যাশা পূরণের গুরুভার বহন করতে তোমাকে আমি বাধা দেব না। যাঁরা আজ তোমার শুভ-পরামর্শদাতা তাদের সঙ্গে আলোচনা কর। যদি তাঁরা তোমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন তাহলে আমারও অনুমোদন রইল।

—রুক্মিণী!

—হ্যাঁ, আমি প্রতীক্ষা করেই থাকব। আমি কামনা করব এই ঘোর দুর্দিন কেটে যাবে। তার আগে আমার ব্যক্তিগত সুখের কথা আমি ভাবব না কখনও। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে তুমি ফিরে এস; আমি ততদিন বরণমালা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকব।

—কিন্তু পরম অবাঞ্ছিত কোন সংবাদ যদি আসে?

বিষাদমাখা হাসি ফুটে ওঠে রুক্মিণীর অধরে। সে বলে, না, তেমন কিছু আমি ভাবতেও চাই না। কিন্তু যদি আসেই সে সংবাদ জানার পরও তোমার রুক্মিণী তার যন্ত্রণাকে ভোগ করবার জন্য বেঁচে থাকবে না।" রুক্মিণীর কণ্ঠে শুধু একত্রে বাঁচাই নয়, একত্রে মৃত্যুবরণেরও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। ইন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুধাবন করে এই তাদের ভবিতব্য, এসবের অন্যথা হবার উপায় নেই।

(এগার)

দিল্লীর দরবার কক্ষ।

দ্বিরদরদনির্মিত সুবর্ণ মণিমুক্তা শোভিত তখ্‌তে আসীন ছিলেন সুলতান মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলক। তাঁর মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে গম্ভীর।

চতুষ্পার্শে সভাসদগণ অপেক্ষা করেছিলেন চূড়ান্ত অস্বস্তি নিয়ে। প্রতিদিনের মত আজকের আলোচনার গতিপ্রকৃতিও কোন্‌দিকে মোড় নেবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র পূর্বধারণা ছিল না তাদের।

কিছুক্ষণের বিরক্তিকর নীরবতার পর সুলতান দিওয়ান-ই-ইনশার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, দিওয়ান-ই-ইনশা, দোয়াবের সাম্প্রতিকতম অবস্থা সম্বন্ধে আপনি কতদূর অবহিত আছেন?

—জাহাঁপনা, দূতের মুখে দিওয়ান-ই-আরিজের কাছ থেকে যে সংবাদ পেয়েছি তা মোটেই প্রীতিকর নয়। বিদ্রোহীরা খুবই সংগঠিতভাবে প্রতি-আক্রমণ করছে। বাদশাহী সেনা সম্মুখ যুদ্ধে অপরাজেয়—একথা ঠিকই। কিন্তু বিদ্রোহীরা আক্রমণ করছে অতর্কিতে, প্রায়শই রাত্রির অন্ধকারে। হিংস্র তরক্ষুর মতো তাদের করাল দংষ্ট্রা, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বাদশাহী সৈন্যবাহিনী।

দিওয়ান-ই-ইনশার মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করতে করতে উদগ্র রোষে সুলতানের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। মনে হয় একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি যেন জেগে উঠেছে এবং অগ্ন্যুদ্‌গারের মতো যে কোন

মুহূর্তে তার ভিতরের আক্রোশও বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমীর-ওমরাহ্-সভাসদগণের বুকের মধ্যে রক্তপ্রবাহ যেন অদৃশ্য কারণে বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

অবশেষে দীর্ঘবিলম্বিত কয়েকটি শব্দ সুলতানের কণ্ঠ থেকে বজ্র-নির্ঘোষের মতো উচ্চারিত হয়, সব অপদার্থের দল। দোয়াবকে শ্মশান করে দিচ্ছে না কেন?

সুলতানের কথার মধ্যেই একটা সূত্র পেয়ে উজীর কথা বলেন এতক্ষণে, বৃদ্ধের গোস্তাকী মাপ হয় হুজুর। জাহাঁপনা আপনিই তো বলেছেন ধ্বংসস্তূপের উপর বসে রাজ্যশাসন করা যায় না। তা না হলে দিওয়ান-ই-আরিজ এতদিনে বহুৎ বার দোয়াবের জমিতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতেন।

নিজের পূর্বাদেশ এবং বর্তমান মন্তব্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা এতই স্পষ্ট যে সুলতান মহম্মদকেও মনে মনে সে কথা স্বীকার করতে হয়। তবু তাঁর হৃদয়ের অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ে পরবর্তী কথায়। তিনি বলে ওঠেন, তার অর্থ এই নয় যে দমন করা যাবে না বিদ্রোহ। এত বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিওয়ান-ই-আরিজ কি করছেন? আসলে সুলতানের প্রতি আনুগত্যেরই অভাব আছে আপনাদের। বিষয়টির যথাযোগ্য গুরুত্ব যেমন আপনারা কেউ উপলব্ধি করছেন না, তেমনি আমার কথারও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ আপনাদের ব্যর্থতা নয়, আপনাদের নিষ্ক্রিয়তা।

অপবাদটি সভাসদগণের পক্ষে যথেষ্ট মর্মান্তিক, নিদারুণ অপমান-করও বটে। কিন্তু সুলতানের সামনে একথা উচ্চারণ করার দুঃসাহস কে দেখাবে! সুতরাং নীরবেই তা সহ্য করতে হয় সকলকে।

শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে সমগ্র দরবারকক্ষে।

সহসা দরবারকক্ষের খাস দারোগা কক্ষে প্রবেশ করে সুলতানকে আভুমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন ও দিওয়ান-ই-ইনশার দিকে অগ্রসর হলেন। পরে তার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ পেশ করলেন। তার আচার-আচরণে যথেষ্ট উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

সংবাদটি শ্রবণ করা মাত্র দিওয়ান-ই-ইনশারও মুখভঙ্গি নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং প্রবল উত্তেজনা তার মধ্যেও সংক্রামিত হল। তিনি দারোগাকে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ প্রদান করলেন এবং দারোগা স্থানত্যাগ করা মাত্র সুলতানকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, শাহানশা, এক ব্যক্তি মহামান্য সুলতানের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

—কি পরিচয় তার?

—জাহাঁপনা, তার নাম ইন্দ্রনাথ, পিতার নাম মহেন্দ্রনাথ। দোয়াবের দক্ষিণে ধাত্রীগড়ে তার জায়গীর। দোয়াবের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের সে-ই প্রধান নায়ক।

দরবারকক্ষে অকস্মাৎ বজ্রপাত হয় যেন। সবাই হতচকিত। এমনকি স্বয়ং সুলতান পর্যন্ত ঘটনাটির আকস্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নেন। তাঁর বাক্‌শক্তিও যেন লুপ্ত হয়ে যায়।

এই ব্যক্তির আচরণকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন তিনিও বুঝে উঠতে পারেন না। স্পর্দ্ধা! দুঃসাহস? না কি অপ্রকৃতিস্থতা? অথবা সবকিছুর সমন্বয়? দুরন্ত প্রচেষ্টায় নিজেকে আত্মস্থ করে মহম্মদ আদেশ দেন, তাকে নিয়ে এস এখানে।

সমস্ত দরবারে তড়িৎপ্রবাহের মত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার স্রোত বয়ে যায়। তারপর কয়েকটি মুহূর্তমাত্র।

দৃঢ় পদক্ষেপে পঞ্চবিংশতি বয়ঃক্রমের সেই যুবক দরবারকক্ষে প্রবেশ করে যার জন্য সম্প্রতি সাম্রাজ্যের কর্ণধার মহম্মদ-বিন-তুঘলকের

পর্যন্ত রাত্রির নিদ্রা তিরোহিত হয়েছে।

মহম্মদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আগন্তুক যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। কিন্তু যুবক অত্যন্ত অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে সুলতানকে অভিবাদন জানায়।

সুলতান অন্তরের গভীরে বিস্ময়বোধ করেন। এই যুবক এখন সম্পূর্ণ তাঁর আয়ত্তের মধ্যে—কিন্তু ভীতি বা সংকোচের লেশমাত্র ভাব ও তার আচরণে কোথায় প্রকাশ পাচ্ছে না। সুলতান ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে যুবকের চোখের গভীরের ভাষা পাঠ করতে চান।

কিন্তু আশ্চর্য! তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির মিলনে যুবকটি চক্ষু আনত করে না; দৃষ্টিতে-দৃষ্টিতে অনিবার্য সংঘর্ষ হয়। দুই উদ্যত অশনি দু'জোড়া চোখে থমকে থাকে।

মানুষ চিনতে মুহূর্ত বিলম্ব হয় না সুলতানের। শেরের বাচ্চা শেরই; পৌরুষহীন ক্লীব নয়। রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটিতে একে বশ করা শক্ত। ভিতরে-ভিতরে তৈরী হন সুলতান। একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মোকাবিলার জন্য।

এরপর যখন কথা বলেন তখন জলভারাক্রান্ত মেঘের মত শোনায় তাঁর কণ্ঠ প্রশ্ন করেন, তোমার জানা আছে রাজদ্রোহিতার কি শাস্তি?

—মৃত্যু।

—তুমি এখন সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তের মধ্যে। তুমি রাজদ্রোহী। তোমাকে যদি সেই শাস্তি দি?

বঙ্কিম একঝলক হাসি ফুটে ওঠে ইন্দ্রনাথের রক্তিম ওষ্ঠাধরে। বাক্যে শাণিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, মৃত্যুর ভয় থাকলে সিংহের গুহায় ইচ্ছা করে পা দিতাম না আমি। সুতরাং মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আমাকে

আপনি দমিত করতে পারবেন না সুলতান।

—কিন্তু যদি আমৃত্যু বন্দী করে রাখা হয় তোমাকে?

—তাতেও আমি শঙ্কিত নই, কারণ সব সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই আমি এসেছি।

—তখন বিদ্রোহ কে পরিচালনা করবে?

—ভুল করছেন মহামান্য সুলতান। বিদ্রোহ একক মানুষের চেষ্টায় সংঘটিত হয় না। আমি সরে গেলে আমার স্থান নেবার লোকের অভাব হবে না। সহস্র ইন্দ্রনাথ দোয়াবের মাটিতে জন্মগ্রহণ করবে। আরো শুনুন জাঁহাপনা, দোয়াবের বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ আরিজ-ই-মামালিকের নেই। এই বিদ্রোহ দমন করতে পারেন একমাত্র আপনি।

—আমি? কিভাবে?

—সেকথা বলার জন্যই এই দরবারে আমার আগমন। ইত্যবসরেই অজস্র মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, অজস্র মানুষ হয়েছে গৃহহীন; বিদ্রোহ চলতে থাকলে এসব আরো ঘটবে। দোয়াবের মানুষের এবার মরণপণ, তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে পর্যন্ত তাদের উপর সংঘটিত অন্যায়ের আর শোষণের তারা প্রতিরোধ করবে।

ইন্দ্রনাথের বক্তব্য শুনতে শুনতে সহসা ধৈর্যভঙ্গ হয় সুলতানের; ক্ষিপ্ত সিংহের মত গর্জন করে ওঠেন তিনি, স্পর্ধার একটা সীমা আছে।

—আবার আমাকে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন সুলতান। কিন্তু আপনার রক্তচক্ষুকে আমি ভয় করি না। হ্যাঁ শুনুন, এইমাত্র আপিন বললেন, অনেককিছুরই সীমা থাকা উচিত। তাহলে শোষণেরও তো একটা সীমা থাকা দরকার।

—কোথায় শোষণ চলছে?

—দোয়াবের সর্বত্র।

—কিভাবে?

—কিভাবে? জিজ্ঞসা করুন আপনার মন্ত্রী-আমীর-ওমরাহদের। ওরা শুধু পারেন নির্লজ্জ চাটুকারিতায় সময় অতিবাহিত করতে। কিন্তু কখনও কি ওরা সাম্রাজ্যের নানা স্থানের যথার্থ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করেন? ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির অভ্রংলিহ চূড়ায় বসে আপনিও কি কোনদিন জানতে চেয়েছেন দোয়াবের প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা?

মহম্মদ অপলক চোখে চেয়ে থাকেন শুধু আর অকপট সত্যভাষণ শ্রবণ করেন। কথাগুলি কিন্তু তাঁর মনে ক্রোধের সমিধ হয়ে ওঠে না, পরিবর্তে ভিন্নতর অনুভূতির সঞ্চার করে। অনুতাপবোধই সুলতানের অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে চায়।

সভাসদেরা মূক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন সবকিছু কিন্তু ঘটনা ধারার সবটাই যেন তাদের কাছে অবোধ্য মনে হয়। একের পর এক অভিযোগ নিঃশব্দে হজম করছেন সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক-- এ কি বিস্ময়। এখনও কেন তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি? তারা শুধু অপেক্ষা করে থাকেন সেই ক্ষণটির জন্য যখন সুলতানের অকম্পিত কণ্ঠ থেকে অমোঘ নিয়তির মত উচ্চারিত হবে সেই শেষ বিধানটি।

কিন্তু সভাসদগণের প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রশ্ন করেন সুলতান দোয়াবের মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি? তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই আমি।

সুলতানের প্রশ্ন ইন্দ্রনাথের আবেগমথিত চিত্তের দুয়ার খুলে দেয় যেন। সে উদ্দীপ্তভাবে বলে চলে, গত তিন বৎসর যাবৎ সেখানে চলছিল নিদারুণ খরা, ঘরে ঘরে অন্নাভাব। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

নেমে এসেছে চতুর্দ্দিকে। গত তিন বছরে এককণা শস্য ফলে নি কোন ক্ষেত্রে। কত প্রজা, কত গবাদি পশু মারা গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এই অবস্থায় যখন দোয়াবের রায়ত প্রজা আপনার দয়ার জন্য প্রহর গণনা করছিল তখনই আপনি এতকালীন চতুর্গুণ রাজস্ব বৃদ্ধির আদেশ জারী করেন। হাহাকার করে ওঠে প্রজা সাধারণ। কিন্তু সেই হাহাকারধ্বনি আকাশে-বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বেই রাজপুরুষরা করসংগ্রহের দাবী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃস্ব-রিক্ত মানুষগুলোর উপর। শুধু মাত্র তাই নয়, চারগুণের বদলে তারা দাবী করে দশগুণ কর।

—এসব অভিযোগ কি সত্য ?

—এর প্রতিটি অক্ষর সত্য। করসংগ্রাহকদের অত্যাচার ক্রমশঃ সীমাহীন হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে তারা অগ্নিসংযোগ করে। নির্বিচারে নারীদের সম্মানহানি করে। দোয়াবের প্রজাদের জন্য মৃত্যু তো লেখাই ছিল, তাই তারা শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহী হয়। হ্যাঁ, নিজেদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার-টুকু অর্জন করার জন্য প্রতিবাদ করার অর্থ যদি হয় রাজদ্রোহিতা তবে তারা রাজদ্রোহী। আমিও রাজদ্রোহী। আমিই তাদের সে পথ দেখিয়েছি। এর জন্য মৃত্যু, কারাদণ্ড যে কোন শাস্তিই যদি আমার প্রাপ্য হয় সেই পরমবাঞ্ছিত দণ্ডাদেশই আপনি উচ্চারণ করুন; এখনই আমাকে বন্দী করুন।

কথাগুলি উচ্চারণ করতে করতে ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সম্মোহিতের মত সব কথা শোনেন মহম্মদ। কিন্তু হৃদয়ের গহন অভ্যন্তরে ক্রোধের কণামাত্র স্ফুলিঙ্গও জ্বলে ওঠে না। পরিবর্তে এক চরম বেদনাময় অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করতে থাকে। সঙ্গে

একদল হঠকারী অভিজাত মানুষের উপর নির্ভর করে রাজকার্য পরিচালনা করার ভ্রান্তির জন্য আত্মগ্লানির পীড়াবোধও তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক এখন তাঁর পর্বতপ্রমাণ ভুলকে বুঝতে পারছেন। কতকগুলি অপদার্থ চাটুকারের প্রতি আস্থাস্থাপন করে চূড়ান্ত যে ভুল করেছেন এখন তার মাশুল তাঁকেই গুণতে হবে। হ্যাঁ, তাই করবেন তিনি। রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেবেন দোয়াবের প্রজাদের সেবাকার্যে ক্ষতি যা হবার ইতিমধ্যে হয়েই গেছে—তার আর প্রতিকার নেই। কিন্তু নতুন করে আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতে দিতে চান না তিনি।

কিন্তু সর্বাগ্রে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন সেই মানুষকে যে তাঁর ভুল সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিয়ে একটা আমূল নাড়া দিয়েছে।

সহস্র স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে মহম্মদ সিংহাসন থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন ইন্দ্রনাথের সামনে। অভাবিতপূর্ব দৃশ্য। আবেগমন্দ্র স্বরে বলেন, যুবক, চরমদণ্ডই তোমার প্রাপ্য। তাই তোমাকে বন্দী করলাম এমন বন্ধনে যা আজীবন অটুট থাকবে। একদা তোমার পিতার সঙ্গে ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসুদ্দিনের পরম প্রীতিকর সম্পর্ক ছিল—আজ তোমার সৌহার্দ আমি অন্তর থেকে কামনা করছি। এই পৃথিবীতে আমি যথার্থই মিত্রহীন, তোমাকে মিত্র হিসাবে পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

সুলতানের কণ্ঠে কথাগুলির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চতুর্দিকে কলগুঞ্জন ধ্বনিত হয়।

তৎক্ষণাৎ মহম্মদের শ্যেনদৃষ্টি দরবার কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত চক্রাকারে ঘুরে আসে। পরক্ষণেই তাঁর স্বভাব-সুলভ কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, দিওয়ান-ই-ইনশা ?

—আদেশ করুন খোদাবন্দ্।

—আগামী দু'দিনের মধ্যে দোয়াবের সর্বত্র প্রচার করে দিন যে প্রজাদের সব কর মকুব করে দেওয়া হল। এমনকি গত তিনবছরের প্রাপ্য করও তাদের পরিশোধ করতে হবে না। দিওয়ান-ই-আরিজকে সংবাদ দিন তিনি যেন সৈন্য প্রত্যাহার করে রাজধাণীতে ফিরে আসেন।

—আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে খোদাবন্দ্।

সুলতানের শ্যেনদৃষ্টি এবার ন্যস্ত হয় উজীরের মুখমণ্ডলে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মহম্মদ বলেন মহামান্য উজীর, দয়া করে এবার একটু নড়াচড়া করুন। দোয়াবের নিঃস্ব প্রজাদের জন্য প্রয়োজনে সর্বপ্রকার সাহায্য যেন রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্য কিন্তু আমি সহ্য করব না।

—আপনার আদেশানুযায়ীই সকল কর্ম সমাধা হবে জাঁহাপনা; উত্তর দিতে গিয়ে বৃদ্ধ উজীরের কণ্ঠস্বরে ভীতিমিশ্রিত কম্পন ধরা পড়ে।

ভকিল-ই-ডর ?

সুলতানের দৃষ্টি এবার অন্তঃপুরের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষকের দিকে ন্যস্ত হয়।

—আদেশ করুন জাঁহাপনা।

—আমার এই পরম-সম্মানিত অতিথির সকলপ্রকার পরিচর্যার ভার আপনার উপর ন্যস্ত হল। দেখবেন, কোনভাবেই যেন আপনার সুনাম নষ্ট না হয়।

পরম সম্মানীয় অতিথিটি যে ইন্দ্রনাথই একথা অনুধাবন করতে কারো কোন অসুবিধা হল না। যার মৃত্যুদণ্ডই ছিল প্রত্যাশিত পরিস্থিতির ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তনে তার এতখানি সম্মান প্রাপ্তি

সকলের বিসদৃশ মনে হলেও সুলতানের সামনে আনুগত্যের অভিনয় করা ছাড়া উপায় কি? ভকিল-ই-ডরও নতমস্তকে তাঁর উপর ন্যস্ত কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। বললেন, আপনার বিশ্বাসের মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমার জীবন পর্যন্ত দান করতে আমি প্রস্তুত আছি, জাঁহাপনা।

—না, এখনই আপনার জীবন দান করার প্রয়োজন নেই, শুধু কর্তব্যকর্মটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করলেই চলবে।

ভকিল-ই-ডর ঠিক ধরতে পারলেন না কথাগুলির মধ্যে বিচিত্র চরিত্র মহম্মদ কতখানি ব্যঙ্গের মিশ্রণ ঘটালেন।

আর একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না সুলতান। সকলের আনত অভিবাদনের মধ্য দিয়ে দরবার কক্ষ ত্যাগ করে অন্দরমহলে চলে গেলেন। অন্যদিনের তুলনায় সে মুহূর্তে তাঁকে অনেকবেশী ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল সবকিছু। লক্ষ্য করছিল অবিশ্বাস্য পট-পরিবর্তন। সম্বিৎ ফিরল ভকিল-ই ডরের আহ্বানে। স্থানত্যাগ করবার আগে মনে মনে স্বীকার করল, সত্যই বড় দুরধিগম্য চরিত্রের মানুষ এই মহম্মদ-বিন্-তুঘলক।

(বার)

আমাদের এই আখ্যায়িকায় পূর্বেই প্রসঙ্গান্তরে বলা হয়েছে যে সমগ্র দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতক ব্যাপী কালসীমায় গোটা সাম্রাজ্যের সর্বত্রই অভিজাতদের মধ্যে সাধারণভাবে মদ্য ও জুয়ার প্রতি তীব্র আসক্তি এবং চারিত্রিক শিথিলতা ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক মাত্রই জানেন যে, কঠোর-চরিত্র কোন সুলতানের রক্ষচক্ষুর ভ্রূকুটিতে সাময়িকভাবে অভিজাতরা নৈতিকতার ভেক ধারণ করলেও তাদের মূল চরিত্র-কাঠামো অপরিবর্তনীয়ই থাকত।

আবার সর্বকালে সর্বদেশেই কঠোর নিয়মবদ্ধতার মধ্যেও আইনগত শৈথিল্য বর্তমান থাকেই। যে কালসীমাকে উপজীব্য করে এই কথাবস্তুর নির্মিতি—সে সময়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না ; ফলে নিয়মানুবদ্ধতার অনুশাসনের মধ্যে থাকার প্রদর্শনী করেও যথেচ্ছ আনন্দের উচ্ছৃংখলতা ভোগ করবার সুযোগও তৎকালের অভিজাত এবং ধনিক-শ্রেণীর ব্যক্তিদেরপক্ষে সহজলভ্য ছিল। সেকালে দাসপ্রথা আইনানুগ ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যোগ রাখলেই আমরা দেখতে পাব যে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী দাসী ক্রয় করতে মোটামুটি একজন অভিজাতকে এক সহস্র থেকে দু'সহস্র তংকা ব্যয় করতে হত। দাস দাসী ক্রয় করার সংখ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে অজস্র সুন্দরী দাসী ক্রয় করে অন্তঃপুরের শোভাবর্ধন করা

এবং আনন্দ-বিলাস উপভোগ করা ধনীব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য ছিল।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে আমরা এও জানতে পারি অনেক সময়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাহুবল সম্পন্ন দাসের পক্ষেও পরবর্তী জীবনে এমন কি দরবারের বিশেষ প্রতিপত্তিসম্পন্ন সভ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বাধা ছিল না। খান্-ই-জাহান মকবুল আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এমনই এক দৃষ্টান্ত, যিনি দাস থেকে আপন প্রতিভা, অধ্যবসায় এবং সামর্থ্যের জোরে সাম্রাজ্যের কর্ণধার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেকসময় এও দেখা যেত সামান্য দাসী হিসাবে কোন অভিজাতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আপন সৌন্দর্য এবং কূটনৈতিক বুদ্ধির জোরে অন্দরমহলের সর্বময়ী কর্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতেন কোন কোন নারী।

গিয়াসুদ্দিন-তুঘলকের আমলে দশ হাজারী মনসবদার ইব্রাহিম খাঁর অন্তঃপুরে এভাবেই একদিন সামান্য দাসী হিসাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল দিলবানু বিবির, তখন তার নাম ছিল পান্নাবাঈ। পরবর্তী কালে পান্নাবাঈ-এর নামান্তর ঘটল—সে হল দিলবানু বিবি! ছিল হিন্দু; জোর করে তাকে ধর্মান্তরিত করা হল।

স্মৃতি প্রায়ই উদ্বেলিত হয় দিলবানুর। সে ছিল সুদূর বিকানীর রাজ্যের এক বৃদ্ধ স্থপতির কন্যা। বৃদ্ধ পিতা দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হতে হতে একদিন তার মানবিকতা বিসর্জন দিল; সামান্য কিছু তঙ্কার বিনিময়ে আত্মজাকে বেচে দিল দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে। তারপর সে নদীর স্রোতে ভাসমান খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছল দিল্লী। সেখানে একদিন দাস-দাসীর হাটে ইব্রাহিম খাঁ'র নজরে পড়ল। সেখান থেকে তার অন্দরমহলে। ইব্রাহিম খাঁ

বড় যোদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু তার চেয়েও বড় লম্পট ছিল। সুন্দরী নারীর জন্য তার লালসা ছিল সীমাহীন।

সহজেই তাই ইব্রাহিম খাঁ দিলবানু বিবির অনিন্দ্য রূপের ফাঁদে ধরা দিল। বহ্নি-লালায়িত পতঙ্গের মত তার অবস্থা; তার সামনে কামনার অগ্নি-সুধা, তা পান করে যতই তার আশা বাড়তে লাগল তৃষ্ণাও বৃদ্ধি পেতে লাগল তদনুপাতে।

দিলবানুর অন্তরে সেই বয়সেই অজস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম জাগ্রত করেছিল দুই বিকৃত মনোবৃত্তি—দুরন্ত প্রতিহিংসা এবং দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা; প্রেমের উৎসমূল শুকিয়ে গিয়েছিল। ইব্রাহিম খাঁর প্রতি ছিল তার চূড়ান্ত বীতরাগ, কিন্তু কথায় বা আচরণে তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে এবং সরল প্রণয়িনীর ভূমিকা অভিনয় করে তিলতিল করে সে জয় করে নিল অন্দরমহলের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব। একসময় দিলবানু বিবির ইচ্ছার পুতুল হয়ে পড়ল ইব্রাহিম খাঁ। ইব্রাহিমের অন্তরের লালসার আগুন যতই লেলিহান হয়ে উঠতে লাগল ততই স্থবিরত্ব গ্রাস করতে লাগল তাকে; অবশেষে লাম্পট্যের খেসারত দিতে প্রৌঢ় বয়সেই দেহান্ত ঘটল ইব্রাহিমের। এর ফলে দিলবানুর হাতে এল অগাধ সম্পদ এবং সঙ্গে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

ইতিমধ্যে যে দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দুরন্ত প্রতিহিংসাবোধ দিলবানু বিবির স্বভাবধর্ম হয়ে উঠেছিল অতঃপর যেন তাদেরই প্ররোচনায় সে এক আশ্চর্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। ধীরে ধীরে দিল্লী নগরীর আমীর-ওমরাহ-অভিজাতদের মধ্যে দিলবানু হয়ে উঠল মক্ষিরাণী। মন্ত্রীরাও বাঁধা পড়লেন তার অনিবার্য আকর্ষণে। বস্তুত তাকে কেন্দ্র করে নগরীর শ্রেষ্ঠ অভিজাতদের মধ্যে শুরু হল অদৃশ্য প্রতিযোগিতা।

দিলবানু লক্ষ্য করে সবই। তার অধরপ্রান্তে ফুটে ওঠে বঙ্কিম হাসি। আজ সকলেই তার কৃপাপ্রার্থী। কাউকেই সে বঞ্চিত করে না, কাউকেই বিশেষভাবে অনুগৃহীত করে না।

দিলবানু জানে তার রূপে আছে দুর্নিবার্য জ্বালা। আর সেই জ্বালাই শেষপর্যন্ত তাকে বহ্নিবিমুগ্ধ কামুক মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করে।

ভাগ্যচক্রের কি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। দশবৎসর পূর্বে জীবন-স্রোতের টানে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছিল দিলবানু. কোথাও তার এতটুকু আশ্রয় মিলল না। আর আজ তারই আশ্রয় পাবার জন্য লালায়িত সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আমীর-ওমরাহদের দল।

কিন্তু এদের জন্য অন্তরের গভীরে শুধু ঘৃণাই আছে দিলবানুর। ঘৃণা কি প্রতিহিংসারই অন্য নাম? নিজেকে সহস্রবার প্রশ্ন করে দিলবানু। ধ্বংস হোক্ এই সব লম্পটের দল। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে উল্লাসে নাচতে চায় সে।

অথচ দিলবানুর মনের কথা তার মুখে ছায়া ফেলে না কখনও। হৃদয়ের তিক্ত ভাষা মুখের দর্পণে ফুটে ওঠে না। সে বোঝে, এখানে যারা আসে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোন মূল্যে তার হৃদয় জয় করা, তার প্রসাদ ভিক্ষা করা।

এই সুযোগটুকু পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করে দিলবানু বিবি। রাজনীতির অতি গূঢ় সংবাদও সে অক্লেশে সংগ্রহ করে এবং একজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অন্যজনের কাছে বিক্রয় করে বহুমূল্য উপহারের বিনিময়ে। অবশ্য উপহার সংগ্রহই তার মৌল উদ্দেশ্য নয়, এভাবেই নিজের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ সকলের উপর কার্যকর করে দিলবানু।

বাজীকর যেমন অদৃশ্য সুতোর টানে পুতুল নাচায় প্রায় তেমন ভাবেই অদৃশ্য কৌশলে দিলবাহু একজন অভিজাতের বিরুদ্ধে অন্যকে প্ররোচিত করে, নিজে থাকে সকল ধরাছোঁয়ার বাইরে। এভাবেই তার অন্তরের গভীরের প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থতা খুঁজে পায়।

দিলবাহুর প্রাসাদে বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ-বিশেষ মন্ত্রীর শুভা-গমন ঘটে। এ বিষয়েও একটা অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘ্য বিধান প্রবর্তন করেছে দিলবাহু; কেউই সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে চায় না। আমীর-ওমরাহদের সকল প্রতিপত্তি দিলবাহুর কাছে এসে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে অপমানিত না হয়ে বরং পরাজয়ের আনন্দই লাভ করেন তাঁরা।

দিওয়ান-ই-ইনশাও এদের ব্যতিক্রম নন। সুলতান প্রদত্ত কার্যভার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার দিলবাহুর অত্যাশ্চ সান্নিধ্যেই আছে তার একমাত্র দিশা; সুতরাং সে রাত্রে দিওয়ান-ইনশার পদধূলি পড়ে দিলবাহুর গৃহে।

দিলবাহুর উষ্ণ অভিনন্দনে আপ্লুত হন মন্ত্রীমহোদয়। দিলবাহুর কথা তাঁর কর্ণে সুধাবৃষ্টি করে যেন।

—উঃ! আমার কি অসীম ভাগ্য যে এতদিন পরে আমার গৃহে আপনার 'পদধূলি' পড়ল। একেবারে ভুলেই গেছেন বিবিকে।

—তোমাকে ভুলে যাব, অসম্ভব। তোমাকে ভুলব সেই যখন খোদাতালার ডাক আসবে উপর থেকে, তার আগে নয়।

নির্লজ্জ চাটুকারিতা করে দিলবাহুর প্রণয়ভিক্ষা করেন দিওয়ান-ই ইনশা।

—তাহলে এত দেরী করে পদধূলি দেন কেন? অভিমানাহত দিলবাহুর কণ্ঠস্বর।

দিলবাহুর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা দিওয়ান-ইনশাকে ভিতরে ভিতরে

উত্তেজিত করে তোলে। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলে ওঠেন, কাজই আমাকে হত্যা করবে জানো!

—এত কিসের কাজ? দিলবানুর কণ্ঠে কৌতুক।

উত্তর দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নীচু করে ফেললেন দিওয়ান-ই-ইনশা, বললেন, কিসের কাজ? অর্থহীন যত কাজ। খেয়াল-খুশীর খেলা খেলছেন সুলতান, তার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। এই আদেশ করলেন, সাতদিনের মধ্যে আদেশজারী করো দোয়াবের রাজস্ব চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা হল। এখন বলেছেন, সব কর মকুব করা হল—এই আদেশ দু'দিনের মধ্যে দোয়াবের সর্বত্র জারী করা হোক্। জরুরী খবর পাঠাও দিওয়ান-ই-আরিজকে যেন সব সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি যতশীঘ্র সম্ভব রাজধানীতে ফিরে আসেন।

—সব কর মকুব করেছেন সুলতান? কি কারণে? কি ভাবে এই অঘটন সম্ভব হল? বিস্মিত প্রশ্ন ধ্বনিত হয় দিলবানুর কণ্ঠস্বরে।

—সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। কেন তুমি শোননি? যাকে বন্দী করার জন্য স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ দোয়াব চষে ফেলছিলেন সেই অপরিণাম-দর্শী যুবক কিনা নিজেই সিংহের গুহায় পা দিল। স্ব-ইচ্ছায় উপস্থিত হল দরবার কক্ষে সুলতানের মুখোমুখি।

—তারপর? দিলবানুর কণ্ঠে অসংহত উত্তেজনা।

—তারপর সুলতানকেই সর্বসমক্ষে অভিযুক্ত করল কাফের যুবক। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না কি দুরন্ত সাহস তার। সুলতানের রোষ-কষায়িত দৃষ্টির সামনেও এতটুকু নমিত হল না। একটা মুক্তফলা তরবারি যেন।

—শাস্তি হল না?

—সেটাই অভাবিত। আমরা যখন কাফেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনবার জন্য সময় গুনছি তখনই সুলতান সিংহাসন থেকে নেমে

এসে তার সৌহার্দ কামনা করলেন। সে এখন সম্রাটের বিশিষ্ট অতিথি।

সম্মোহিতের মত দিলবাহু এতক্ষণ শ্রবণ করছিল দিওয়ান-ই-ইনশার কথাগুলো। এবার বলে উঠল, একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন হুজুর?
—প্রার্থনা কেন বলছ দিলবাহু, বল আদেশ।
—একবার দেখাতে পারেন সেই যুবককে। চক্ষু সার্থক করতে ইচ্ছে করছে তাকে দেখে যে সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকেই অভিযুক্ত করতে পারে।

প্রস্তাবটা শোনার পর চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে দিওয়ান-ই-ইনশার কপালে। সামান্য বিরতির পর উচ্চারণ করেন, ব্যাপারটা তোমার আয়ত্তের মধ্যেই আছে। ভকিল-ই-ডরের কাছে গোপন বার্তা পাঠাও। তিনিই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। অতিথি পরিচর্যার সমস্ত দায়িত্ব এখন তারই উপর ন্যস্ত।

দিওয়ান-ই-ইনশার নির্দেশই মেনে নেয় দিলবাহু।

তার খাস বাঁদীর মুখে সেদিনই গভীর রজনীতে দিলবাহুর গৃহে পদধূলি দেবার আমন্ত্রণ-বার্তা পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন ভকিল-ই-ডর।

মরুবৎ তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে হৃদয়; দিলবাহুর সান্নিধ্যেই সকল তৃষ্ণার শান্তি।

সে রাত্রে নগরীর রাজপথ যখন সুপ্তিমগ্ন তখন নিঃশব্দে ভকিল-ই-ডর দিলবাহুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। সুলতানী অন্তঃপুরের আইন শৃঙ্খলার নিয়ামক তিনি, কিন্তু অন্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্বে তাঁকেও সকল রকম গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়।

দিলবাহু কণ্ঠে সুধা ঢেলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়, আসুন হুজুর। আমি ধন্য। দাসীর প্রার্থনা তাহলে নামঞ্জুর হয় নি।

—প্রার্থনা বলছ কেন, বল হুকুম। তোমার আদেশ কি না মেনে পারি? দিলবানুর রক্তিম অধরে অতঃপর যে অনুরাগের হাসি স্ফুরিত হয় তাতে ভকিল-ই-ডরের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। তিনি প্রশ্ন করেন, তা এত জরুরী বার্তা কেন বিবি?

—কেন, আপনার দর্শনপাবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হতে পারে না? অভিমানাহত দিলবানুর কণ্ঠস্বর।

দিলবানুর মহলে ভকিল-ই-ডরের গতায়াত কিছু নতুন নয়, কিন্তু এতখানি অনুরাগমাখা কণ্ঠে কোনদিনই তিনি ইতোপূর্বে তাকে কথা বলতে শোনেননি। তার কণ্ঠের অনুরাগের রং ভকিল-ই ডরের হৃদয়কেও রক্তরাগরঞ্জিত করে তোলে।

এতদিন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত উদ্বেলিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু দিলবানুই একটা অলঙ্ঘ্য সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আজ সেই দিল-বানুরই কণ্ঠে যে মাদক আমন্ত্রণ তা বুঝি ভেঙে দেবে সকল সীমারেখা; একেবারে সম্মোহিত হয়ে গেলেন ভকিল-ই-ডর।

উত্তেজনাকম্প্র স্বরে বললেন, আজ যে দিলবানুর গলায় নতুন সুর?

—নতুন-পুরানো জানি না জনাব তবে এটুকু বুঝছি ডেকে না পাঠালে এখন আর দিলবানুর মহলে আপনার পদধূলি দেবার সময় হয় না। সে এখন বাসী ফুল।

—ভুল, ভুল, সব ভুল। তোমার চেয়ে টাটকা ফুল সুলতানের হারেমেও নেই দিলবানু। তোমার একটু দর্শন পাওয়ার জন্য তৃষিত চাতকের মত অপেক্ষা করে থাকি, তা কি তুমি জানো না?

—তাহলে অনুগ্রহ করে সাক্ষাৎ দেন না কেন?

—আমার অনুগ্রহ বলছ? বরং বল আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ। সপ্তাহের একটা দিনই তো আমার। কৃপা করে সাতটা দিনই

আমার করে দাও, দেখবে এ বান্দা সাতদিনই তোমার দরজায় হাজির আছে।

ভকিল-ই-ডরের কথা শুনতে শুনতে দিলবানুর অধরে প্রণয়াসক্তা নারীর ব্রীড়া-অরুণিত হাসি ফুটে ওঠে। খঞ্জন-নয়ন নেচে ওঠে কৌতুকে। অবাধ্য চূর্ণ কুন্তলগুলি মধুলোভী ভ্রমরের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে কমলসদৃশ মুখাবয়বে। নমনীয় শরীরে লীলাতরঙ্গ তুলে দিলবানু দুই মৃণাল ভুজ তুলে ধরে অবাধ্য কুন্তলগুলিকে শাসনপাশে বশ করার জন্য। ভকিল-ই-ডরের বুকের মধ্যে রক্তের গতি দ্বিগুণিত হয়, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় গলা যেন কাঠ হয়ে আসে। মনে হয় তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কামনা যেন মূর্তিমতী হয়ে দিলবানুর মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভকিল-ই-ডরের হৃদয়ের কথা অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করেই যেন দিলবানু হুকুম জারী করে, এই কে আছিস, শরাব দে।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করার জন্য দাসী সুরাপূর্ণ ভৃঙ্গার এবং পানপাত্র হাজির করে। পানপাত্র উৎকৃষ্ট আসবে পূর্ণ করে দিলবানু এগিয়ে ধরে ভকিল-ই-ডরের দিকে।

দুর্বার তৃষ্ণায় ভকিল-ই-ডর টেনে নেন পানপাত্র, তারপর এক চুমুকে নিঃশোষিত করে ফিরিয়ে দেন দিলবানুর হাতে।

—আর এক পেয়ালা?

—না দিলবানু, আজ এটুকুই থাক। গুরুতর রাজকার্য ফেলে ছুটে এসেছি তোমার ডাকে, কিন্তু এখনি ফিরে যেতে হবে রাজান্তঃপুরে। মহামান্য সুলতানের অতিথির পরিচর্যায় যদি অবহেলা হয় সুলতানের আদেশে মাথা যাওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং আর এক পেয়ালা পান করে বুদ্ধি গুলিয়ে ফেলে নিজের সর্বনাশ করার বাসনা নেই বিবি। দিনটা আজ বৃথা গেল।

—কে এমন মহামান্য অতিথি তিনি যার চিন্তায় ভকিল-ই-ডরেরও প্রমোদে বিঘ্ন ঘটছে ?

এক হিন্দু কাফের, নাম ইন্দ্রনাথ। কিন্তু হিম্মৎ আছে বটে তার। শেরের বাচ্চা শের।

—একথা বলছেন কেন ?

—বলব না তো কি ? যাকে বাল্যকাল থেকে দেখছি অথচ যার রক্তচক্ষু দেখলে বুকের ভিতর রক্ত এখনও হিম হয়ে আসে, সেই জুনা খাঁর মুখের উপরই তাকে অভিযুক্ত করার হিম্মৎ··· ········

ভকিল-ই-ডরকে কথা শেষ করতে না দিয়েই দিলবাম্নু বলে ওঠে, গোস্তাকি মাফ হয় জনাব, একটা আর্জি আছে।

--আর্জি, না আদেশ ?

—সে যাই বলুন। এই হিন্দু কাফেরকে একবার আনবেন আমার মহলে ? মাত্র একবার।

ভকিল-ই-ডরের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, তাকে নিয়ে খেলা করবার সখ হয়েছে বিবির ? হ্যাঁ, সে তোমার উপযুক্ত বটে। আমাদের তো বশ করেই ফেলেছ, এখন দেখ শেরকে পোষ মানাতে পার কি না ? অবশ্য মনে হয় না সে বাগ মানবে।

—আনুনই না তাকে একবার।

—তোমার মর্জি। সুলতানের মেহমানকে পৌঁছে দেব তোমার জিম্মায়। তারপর দেখ··········

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই গাত্রোত্থান করেন ভকিল-ই-ডর। দিলবাম্নুর অধরে ভুবনমোহিনী হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

(তের)

দিনকালের পরিবর্তন যে অভ্রান্তভাবেই ঘটে গেছে, একথা দিল-বানুর চেয়ে বেশী আর কে জানে ?

এখন সে আকাঙ্ক্ষা করবে অথচ প্রার্থিত বস্তু তার করতলগত হবে না—এ কখনও হওয়া সম্ভব নয়।

ভকিল-ই-ডরের কাছ থেকে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়ার জন্য তাই সামান্য ছলাকলার আশ্রয় নিতে হলেও সে যে এ ক্ষেত্রে সফল হবেই এ বিষয়ে তার হৃদয়ে কোন আশংকার অবকাশমাত্র ছিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে রাত্রে দিলবানুর নিদ্রা কেন যেন বার বারই ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হল। পরদিন তার নিদ্রাভঙ্গ হল একটা বুকচাপা অস্বস্তির মধ্যে।

গতদিন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করবার সময় ভকিল-ই-ডর যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে ব্যঙ্গটুকু অথবা তার সম্ভাব্য পরাজয় সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতটুকু ছিল, তাই কি তার অস্বস্তির কারণ—ভাবতে চায় দিলবানু বিবি।

সঙ্গে সঙ্গেই সে এই স্থির প্রতীতিতে পৌঁছে যায় যে এ নিয়ে তার মনের গহনে বিন্দুমাত্র দ্বন্দ্বও নেই। নিজের মোহিনীশক্তি সম্বন্ধে এতটুকু হীনমন্যতাবোধ এখনও তার মনে স্থান পায় না। সে জানে, কোন পুরুষ তা সে যতই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হোক না কেন—ধরা দেবেই তার মোহিনীমায়ার জালে।

এখনও সে সমান কুহকিনী, তার দেহাধারে এখনও তুর্নিবার্য মদনাগুন। পুরুষমাত্রই তাকে দেখে প্রলুব্ধ হতে বাধ্য। বহ্নি-বিমুগ্ধ পতঙ্গ তারা—ঝাঁপ দেবেই কামাগ্নির দহনে দগ্ধ হয়ে মরবার জন্য।

তবে কেন অস্বস্তি? তার মূল্যানুসন্ধানে যতই ব্যর্থ হয় ততই যেন সূচীমুখ কাঁটার মত তা বিঁধতে থাকে দিলবানুকে।

এভাবেই অশান্তিতে কাটে দিনটা। সন্ধ্যাসমাগমে সহসা চকিতে অস্বস্তির কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায় দিলবানুর কাছে।

আর কেউ না বুঝলেও দিলবানু বোঝে তার জীবনে যৌবন এখন মধ্যাহ্নগগন অতিক্রম করে ঈষৎ পশ্চিমগামী। তার এই জীবন-বৃত্তে অগণিত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে সে ইতোমধ্যে, কিন্তু তারা প্রায় সবাই ব্যক্তিত্বহীন কামুক পুরুষ। কচিৎ দু-একটি সৎ-মানুষেরও সান্নিধ্যে এসেছে। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই তো তার স্বপ্নের নায়ক নয়। তার এই দেবভোগ্য রূপ-যৌবন তাহলে তো ব্যর্থই, তার প্রত্যাশা তো চিরকালই রয়ে গেল অচরিতার্থ।

রমণীজীবন লাভ করে কোন পুরুষের কাছে নিজের হৃদয়কে সে উৎসর্গ করতে পারল না—এই যন্ত্রণা নিয়ত দগ্ধ করে দিলবানুকে।

হঠাৎই তাই দিওয়ান-ই-ইনশার মুখে ইন্দ্রনাথ নামক যুবকের কথা শুনে তার প্রেমহীন চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ভকিল-ই-ডরের কাছে একই রকম বিবৃতি শুনে তার প্রত্যাশার দীপটি আরও প্রোজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠে। ইন্দ্রনাথ নামক হিন্দু যুবকটি যে অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব নিঃসংশয় হয় সে বিষয়ে।

কিন্তু যতই সময়ের ব্যবধান কমে আসতে থাকে ততই একটা গভীর আশঙ্কাবোধ সংক্রামিত হতে থাকে দিলবানুর অন্তরে। সাহসী, বীর্যবন্ত ও পৌরুষব্যঞ্জক পুরুষই তো তার একমাত্র কাম্য নয়, তাকে

হতে হবে আকর্ষকও। প্রেমিক পুরুষেরই সে আকাঙ্ক্ষী।

সিংহের মত বলশালী অথচ স্থূলবুদ্ধি এবং কুরূপ পুরুষ তার কাঙ্খিত নয়। আর এখানেই দিলবানুর যত আশংকা।

দিওয়ান-ই-ইনশা এবং ভকিল-ই-ডরের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হলেও তার বহু-অপেক্ষিত রমণীহৃদয় জয় করবার উপযুক্ততা থাকবেই সে পুরুষের—এ নিশ্চয়তা কোথায়!

এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যার জন্য প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে সে অপেক্ষা করে আছে তার চিত্তপটে সে বিন্দুমাত্র ছাপ ও ফেলতে পারল না। তার তৃষিত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ না করে বরং তার যন্ত্রণাকে বৃদ্ধি করে দিল মাত্র।

তখন সে মোহভঙ্গের বেদনা কি করে বহন করবে দিলবানু! রাত তাই যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে তার চিত্তোদ্বেলতাও তদনুপাতে, বৃদ্ধি, পেতে থাকে। তবু অতি যত্নে নিজেকে সজ্জিত করে দিলবানু। প্রত্যাশা-পূরণ নাই হোক, কিন্তু সে যে সাধারণ নয় বরং অলোক সামান্য সেটা অন্তত প্রমাণিত হোক আজকের সকল আয়োজনের উপলক্ষ্য মানুষটির কাছে।

রাত্রির দ্বিতীয় যামার্ধে একটি সুসজ্জিত শিবিকা এসে থামে দিলবানুর প্রাসাদোপম গৃহের সম্মুখে। ভকিল-ই-ডর তাঁর বচন রক্ষা করেন। দাসদাসীদের আনত অভিবাদনের মধ্য দিয়ে তিনি অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হন তার সঙ্গী ইন্দ্রনাথ—আজকের মহামান্য অতিথি।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। ইন্দ্রনাথের মনের স্বচ্ছ দর্পণে কেন যেন মৃদু অস্বস্তির ছায়াপাত ঘটে। তবু ভকিল-ই-ডরকে অনুসরণ করে সে।

চতুর্থ মহলটি প্রকৃত অন্তঃপুর। তার প্রবেশপথে অতিথিদ্বয়কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দিলবানু অপেক্ষা করে। ভকিল-ই-ডরের

বিশাল দেহের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে আজকের প্রকৃত অতিথি তার দিকেই এগিয়ে আসছেন, লক্ষ্য করে দিলবানু। তারপর ক্রমশই দূরত্ব কমে আসে, তাঁরা দু'জনেই নিকট সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ান; কিন্তু এখন পাশাপাশি।

দিলবানু পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নবীন অতিথির দিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যই। তারপর তার দৃষ্টি আপনিই আনত হয়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যেই তার চিত্তবীণার সবকটি তার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে এক অনন্যপূর্ব সুরঝঙ্কার বেজে ওঠে।

এই তো সে পুরুষ যাকে সে চিরকাল কামনা করে এসেছে। পুরুষ এমন মাদক সৌন্দর্যের অধিকারী! দিলবানুর সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষার শেষ সীমাও বুঝি কখনও এখানে পৌছতে পারে নি। জীবনে এই প্রথম দিলবানুর অন্তরে কোন পুরুষের পায়ে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পন করে দেবার জন্য তীব্র আকুতি জেগে ওঠে।

ভকিল-ই-ডরই অতঃপর নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, দিলবানু, তোমার ঘরে মহা সম্মানিত মেহমান এসেছেন, তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ কর। এ কেমন আতিথেয়তা তোমার যে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ?

ভকিল-ই-ডরের কথায় স্বপ্নভ্রষ্ট দিলবানু বাস্তবে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকে আনত অভিবাদন জানায় সে। তার কণ্ঠে অতঃপর যেন বীণা বেজে ওঠে; বলে, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। এ কি অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য আমার আপনারা দু'জনে একত্রে পদধূলি দিয়েছেন এই দীনার গৃহে। আমার গৃহ আজ ধন্য হল। ভিতরে প্রবেশ করতে আজ্ঞা হোক্।

ভকিল-ই-ডরের চোখে কৌতুক নেচে ওঠে। ইতোমধ্যেই একটি ভিন্নস্বাদের নাটক জমে ওঠবার পূর্বাভাস পেয়ে গেছেন তিনি,

সেখানে তাঁর দৈহিক উপস্থিতি একান্তভাবেই অনাকাঙ্ক্ষিত। দিলবানু বিবির অন্তরেও সম্মোহ জাগ্রত হয়েছে। এখন এই যুবক শেষপর্যন্ত নিজেকে ঔদাসীন্যের আবরণে ঢেকে রাখতে পারলেই দিলবানুর যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হয়। যেটুকু যাচাই করেছেন তা যদি ভুল না হয় তবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ যুবক বিভ্রান্ত হবে না দিলবানুর মোহিনী মায়ায়। মহম্মদের রক্তচক্ষুর ভ্রূকুটি যাকে নমিত করতে পারেনি, নারীর কটাক্ষও সে জয় করবে—এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাটামঞ্চ থেকে তাঁর নিঃশব্দ প্রস্থান।

তাই দিলবানুর সাদর অভ্যর্থনা কৌশলে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য ভকিল-ই-ডর বলে ওঠেন, আজও তোমার আমন্ত্রণ আমি রাখতে পারছি না বিবি। অত্যন্ত জরুরী রাজকার্য থাকায় আমাকে রাজান্তঃপুরে এখনই ফিরে যেতে হবে। আজ তোমার মেহমানের মনোরঞ্জন কর। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর গৃহ থেকে অতিথি যেন অতৃপ্ত থেকে ফিরে না যায়। যথাসময়ে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য দ্বারে শিবিকা অপেক্ষা করবে।

অতঃপর দিলবানু বা ইন্দ্রনাথকে অন্য কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ভকিল-ই-ডর স্থানত্যাগ করেন।

সমস্ত ঘটনার আকস্মিক পট-পরিবর্তন ইন্দ্রনাথকে ভিতরে ভিতরে সাবধানী করে তোলে। ভকিল-ই-ডরের দ্রুত প্রস্থান, অগ্নি-শিখার মতো রূপবতী এই নারীর সান্নিধ্য, সম্পূর্ণ অচেনা অবস্থান—সবকিছুর মধ্যেই এক প্রতিকূল পরিবেশের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তার অন্তরের অভিঘাতগুলিকে অন্তরের গভীরেই লুকিয়ে রাখে সে, মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হতে দেয় না।

দিলবানু সাদর আহ্বান জানায়, বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি,

দয়া করে ভিতরে এসে উপবেশন করুন।

ইন্দ্রনাথ কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে আসনে উপবেশন করে। তার থেকে সামান্য দূরে অন্য একটি আসনে বসে দিলবানু।

এতক্ষণ দিলবানুর মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে অতি সূক্ষ্ম একটি রেশমী জাল বিস্তৃত ছিল, তাই মুখের আভাস পেলেও পরিপূর্ণ মুখশ্রী ইন্দ্রনাথের নজর পড়েনি। এখন দিলবানু অপসারিত করে সেই আচ্ছাদন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রানন ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয়। আর তার হৃদয়ের গভীরে অননুভূত এক আলোড়ন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

চেষ্টা করেও ইন্দ্রনাথ তার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এ কি অনুপম রূপবতী! মর্তালোকে এমন সৌন্দর্য কিভাবে সম্ভব? কমনীয়তা, লাবণ্য, সারল্য, মাধুর্য—সবকিছুর এক অতুলন সংমিশ্রণ। ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি ধীরে ধীরে এই রমণীর মুখমণ্ডল থেকে নেমে এসে দেহাধারের উপর ন্যস্ত হয়। একে তো দেহ বলা উচিত নয়—এ রতিকুহর। অজস্র মন্মথ শরে পুরুষকে বিদ্ধ করবার জন্যই যেন এই নারীর সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথ উদগত শ্বাস মোচন করে।

তার মনের গভীরে তার বিবেক তাকে সচেতন করে। অন্তর্লোকে দারুণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দুর্নিবার্য কামনাময়ীর সান্নিধ্যে পুরুষের পক্ষে বীতকাম থাকা অসম্ভব। সুতরাং আশু স্থান ত্যাগ করাই মঙ্গল; অন্যদিকে রূপপিপাসী আঁখি কমললুব্ধ ভ্রমরের মত নিরন্তর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় এই রমণীর চন্দ্রাননে এবং দেহবিতানে।

ইন্দ্রনাথের হৃদয়ের গহনে যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে একথা অভ্রান্তভাবেই অনুমান করতে পারে দিলবানু। তার প্রশ্নেই তা ধরা পড়ে, কি ভাবছেন?

ইন্দ্রের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। প্রত্যুত্তরে বলে, না

কি আর ভাবব। ভাবছি পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা।

—বুঝতে পারলাম না।

—কোথায় এতক্ষণ সুলতানের কোপে কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত হবার কথা, সেখানে এই অচেনা পরিবেশে রাজধানীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর গৃহে কালাতিপাত করবার সৌভাগ্য লাভ।

—আপনার পক্ষে অচেনা পরিবেশ ঠিকই, কিন্তু আপনি আকাঙ্ক্ষা করলেই তো এ পরিবেশ আপনার চিরপরিচিত হতে পারে।

—কিভাবে ?

—মাঝে মাঝে দিলবানুর গৃহে আপনার পদধূলি পড়লে।

—কোথায় দিল্লী, আর কোথায় দোয়াব! আর কোনদিনই এ গৃহে হয়ত আমি পদার্পণ করব না।

—আমি, বিশ্বাস করি না। যার জন্য সারাজীবন ধরে তৃষিত চকোর অপেক্ষা করে থাকে তার সাক্ষাৎ পেয়েও আবার তাকে কি সে হারাতে পারে ?

—আপনার কথার তাৎপর্য আমার ঠিক বোধগম্য হল না। কার জন্য কে অপেক্ষা করে ছিল ?

উত্তর দিতে গিয়ে একটুকরো ক্লিষ্ট হাসি ফুটে ওঠে দিলবানুর রক্তিম ওষ্ঠাধরে। সারাজীবন ধরে পুরুষের সঙ্গে প্রেমের ছলনা করেই কেটেছে, অথচ তখন হৃদয়ের গভীরে প্রেমের কোন প্রস্রবন ছিল না। আজ যখন তার সমস্ত হৃদয়-মন প্রাণ প্রেমের উন্মেষে জেগে উঠেছে তখনও ছলনা করার সার্থকতা কি! এই আশ্চর্য যুবক তার স্বাভাবিক কপট-প্রণয়ের প্রবণতাকে মুহূর্তে দূর করে তার ভিতরের চিরন্তন প্রেমিকা সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে। তাই আজ ছলনা নয়, আজ একান্তভাবেই আত্মনিবেদন। তাই দিলবানু আবেগমথিত কণ্ঠে বলে ওঠে, দিওয়ান-ই-ইনশা ও ভকিল-ই-ডর উভয়ের মুখেই

আপনার গুণকীর্তন শুনে ভীষণ দেখার ইচ্ছা হয়েছিল। এখন বুঝছি আপনার দর্শন না পেলে সারাটা জীবনের সাধই অপূর্ণ থেকে যেত।

—তা হলে আপনিই কৌশলে আমাকে এখানে আনিয়েছেন? আর আপনার প্রভাবেই ভকিল-ই-ডরের আকস্মিক অন্তর্ধান?

—অস্বীকার করছি না আপনার অভিযোগ। আর তার জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য হয়ে থাকে আমার আপনি তার দণ্ডবিধান করুন, আমি মাথা পেতে নেব।

দিলবাহুর কণ্ঠস্বরে আত্মসমর্পণের সুর এমন করুণভাবেই ধ্বনিত হয় যে ইন্দ্রনাথ চকিতে এই মোহিনী নারীর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারে না। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে, সে মুখে অনির্বচনীয় ভাব-রাশির সমাবেশ। আর সবকিছুর উপর যেন ব্যথাহত কান্নার একটা সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়ে রয়েছে।

ইন্দ্র নতুন করে একবার মুগ্ধ হয়। সে অনুভব করে তার পক্ষে এই মুহূর্তে এই স্থান পরিত্যাগ করা প্রয়োজন, নতুবা সৌন্দর্যের মোহজালে সে বদ্ধ হয়ে পড়বেই। সময় যত অতিক্রান্ত হবে ততই এই আলোকসামান্য নারীর রূপসুধা থেকে এক অঞ্জলি পান করবার জন্য হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠবে। উদগ্র এই মোহাকর্ষণ। এর নিকট-সান্নিধ্যে তীব্র সুরার প্রতিক্রিয়ার মত কামমত্ততা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও এক উপলব্ধি ইন্দ্রনাথের হৃদয়কে সচেতন করে। এই অতুলন সৌন্দর্যময়ী যদি তার আচরণে প্রতিস্পর্দ্ধা প্রকাশ করত তবে তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা চলত। কিন্তু এর কণ্ঠে দয়িতা নারীর আত্মনিবেদনের সুর, আচার-আচরণে সুভদ্র নম্রতা, আয়ত চোখে আগুনের পরিবর্তে অশ্রু। এই নারীকে প্রত্যাঘাত করা চলে না। নয় একে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হয়, নতুবা পলায়ণই

শ্রেয়।

সুতরাং আর কালক্ষেপ নয় কোনভাবেই। ইন্দ্রনাথ তার পরবর্তী কথায় তারই ইঙ্গিত দেয়, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভি-যোগই নেই; আর তাছাড়া দণ্ডবিধান করবার আমি কে? এবার কৃপা করে আমাকে বিদায় দিন।

ইন্দ্রনাথের কথা কর্ণ গোচর হওয়া মাত্র দিলবাহুর সমস্ত দেহ শিহরিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়. আর্তস্বরে বলে ওঠে এত শীঘ্র আপনি কোথায় যাবেন? আপনি এলেন আমার গৃহে, এতটুকু আপ্যায়ন করবারও সুযোগ দেবেন না আমাকে?

--আমাকে এখনি যেতে হবে।

—শিবিকা পাবেন কোথায়?

—আমি হাঁটতে অপারগ নই।

—এই অচেনা নগরীতে পদব্রজে আপনি কোথায় যাবেন? কে আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে?

—আমি পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে পথের সন্ধান জেনে নেব।

—তবু আপনার যাওয়া হতে পারে না।

—কেন?

—ভকিল-ই-ডরকে আমি কি জবাবদিহি করব। তিনি আপনাকে আমার তত্ত্বধানে রেখে গেছেন। আপনার শুভাশুভের কথা বিবেচনা করে আপনাকে আমি অজানা পথে ছেড়ে দিতে পারি না।

—আমাকে যেতে হবে।

—না।

—আমাকে যেতেই হবে।

ইন্দ্রনাথ আর অযথা কালক্ষেপ না করে আসন ত্যাগ করে দ্বারের দিকে অগ্রবর্তী হয়। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হবার পরই তার

গতি ব্যাহত হয়। জ্যামুক্ত তীরের মত দ্রুতবেগে দিলবানু এসে তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। ইন্দ্রনাথ তিক্ত স্বরে বলে ওঠে, এভাবে আমাকে বাধা দেওয়ার অর্থ কি?

দলিতা কালনাগিনী যেভাবে উর্ধ্বফনা বিস্তার করে প্রণয়-প্রত্যাখ্যাতা দিলবানুও সেভাবে ক্রোধ-অরুণিত মুখ তুলে ধরে ইন্দ্রনাথের দিকে। যে চোখে মুহূর্ত পূর্বেও ক্রন্দনের আভাস লেগে ছিল সেখানে ফুটে ওঠে আগুনের ঝিলিক। চাপা অথচ স্পষ্ট স্বরে বলে, কিসের তোমার এত গর্ব যে নারীর প্রেমার্ত কোমল হৃদয়কে দু'পায়ে দলিত করে চলে যাচ্ছ? দিলবানু কোনদিন কারো কাছে প্রেমভিক্ষা করে নি। পরন্তু সকলে তারই কৃপা ভিক্ষা করে থাকে। আজ যখন সে দু-হাত অঞ্জলি করে প্রণয় ভিক্ষা করছে, নিজের সর্বস্ব তোমার পায়ে নিবেদন করতে চাইছে—তখন তুমি তাকে পদতলে পিষ্ট করে চলে যেতে পার না।

—আমাকে যেতেই হবে।

সুবিপুল উত্তেজনায় আরো দু'একপদ সামনে এগিয়ে আসে দিলবানু। এত নিবিড় সান্নিধ্যে যে তার দেহের উত্তাপও যেন অনুভব করতে পারে ইন্দ্রনাথ। তারপর পূর্বাপর বিস্মৃত হয়ে চকিতে অপসারিত করে বক্ষাঞ্চল। সূক্ষ্মাবরণ অন্তর্বাসের অন্তরাল ভেদ করে প্রকট হয় পীবর উরস যুগ। বক্ষের উপর হাত রেখে গর্বোদ্ধত কণ্ঠে বলে দিলবানু; এই হৃদয়ে তোমাকে স্থান দিয়েছি, আজ হোক্ কাল হোক্ এই হৃদয়ে তোমাকে ধারণ করবই।

পুষ্পকেতু যেমন তাঁর নিক্ষিপ্ত পুষ্পশরে দেবাদিদেবকে বিদ্ধ করেছিলেন তেমনি দিলবানু তার শেষ অব্যর্থ শরে বিদ্ধ করে ফেলে ইন্দ্রনাথকে। ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যকে চিরন্তন কামাগ্নির আগুনে ভস্মীভূত করে জয় করে নেয় প্রার্থিত ফল।

ইন্দ্রনাথ বোঝে তার সমস্ত প্রতিরোধ প্রচেষ্টা নিঃশেষিত হয়েছে। দুর্দমনীয় এই নারী। তার সমস্ত মস্তিষ্কের কোষে এখন শুধু রূপ পিপাসা। উর্বশীর মতো উদ্ভিন্নযৌবনা এই নারী। হৃদয়-কোরক মেলে অপেক্ষা করে আছে সুধাপান করার জন্য। তবে তাই হোক্, তাকে তৃপ্ত করবে সে। মিথ্যা হোক্ অতীত, মিথ্যা হোক্ ভবিষ্যৎ শুধু সত্য হোক্ আজকের এই রমণীয় বর্তমান।

যে জয় তার চিরকাঙ্ক্ষিত ছিল তা যে তার করায়ত্ত হয়েছে ইন্দ্রনাথের দৃষ্টির পরিবর্তন থেকেই সে কথা অভ্রান্তভাবে অনুমান করে দিলবানু। এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অনুগত পুরুষ যে কামশরে জর্জরিত। যার দৃষ্টিতে এখন আর বিরোধিতা নেই, আছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা।

দিলবানুর অধরে তৃপ্ত হাসির রেখা ফুটে ওঠে। নিজের দুই মৃণাল বাহুলতা দিয়ে শৃঙ্খলিত করে নেয় ইন্দ্রনাথের দুই পরুষ বাহু। আশ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলে, চলে যাবে না?

প্রবল আবেগোচ্ছ্বাসে ইন্দ্রনাথের দেহ কেঁপে ওঠে। দুর্বার আকর্ষণে দিলবানুর অনিন্দ্য দেহবল্লরীকে আবদ্ধ করে বাহুপাশে। চোখের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মেলে, এখন 'চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু আগুনে আগুনে কথা'

দু'জনেই ভুলে যায় অতীতের ঘটনাবলী। পৃথিবীকে মনে হয় অলীক। সত্য শুধু দুই বুভুক্ষু হৃদয়ের মিলনমাধুর্য। দু'জনেই চায় এই মিলন অনন্ত হোক্—এই বিভোরতা অক্ষয় হোক্।

সহসা ইন্দ্রনাথ নিজেকে তৃষ্ণার্ত বোধ করে। দিলবানুর কানে কানে বলে, আমি খুব তৃষ্ণার্ত দিলবানু, আমাকে কিছু পানীয় দিতে পার?

—কেন, আমার রূপসুধা পান করেও বুঝি তোমার তৃষ্ণা মেটে না?

এই তো রয়েছে দেহভৃঙ্গার, যত ইচ্ছা পান কর।

—সত্যিই আমি তৃষ্ণার্ত।

চকিতে নিজের ভুল বুঝতে পারে দিলবানু। আলিঙ্গনমুক্ত হবার চেষ্টায় বলে, আমাকে ছাড়, আমি তোমার পাণীয় আনছি।

আরো দৃঢ় আলিঙ্গনে ইন্দ্রনাথ বেঁধে ফেলে দিলবানুকে। বলে, তোমার মহলে কি দাস-দাসীর এতই সংকুলান যে তারা তৃষ্ণার্তকে পানীয় যোগান দিতে পারে না?

কুটিল কটাক্ষবানে ইন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করে দিলবানু। তারপর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, রুক্মিণী শরাব দে।

রুক্মিণী···রুক্মিণী···রুক্মিণী···শব্দটি তীক্ষ্ণফলা ছুরিকার মত ইন্দ্রনাথের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করে। যে অতীত ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তা সহসা বিস্মৃতির পর্দা অপসারিত করে অতি-উজ্জ্বল আখরে ফুটে ওঠে হৃদয়পটে।

রুক্মিণী নামক এক অনাঘ্রাত ফুল তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার সঙ্গে সে বাগদত্ত। নিজেকে ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত করলে সেই ক্লেদাক্ত, শরীর-মন নিয়ে সেই অনাঘ্রাতার সঙ্গে সে কি আর কোন-দিনই মিলিত হতে পারবে?

ধিকার, ঘৃণিত ধিকার বোধে মুহূর্তে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় ইন্দ্রনাথের। চোখের দৃষ্টি থেকে মুছে যায় আরক্তিম নেশা, শিথিল হয়ে আসে আলিঙ্গন। কয়েক পদ পিছিয়ে আসে চকিতে।

পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন এমন কি দিলবানুকেও হতচকিত করে দেয়। বিস্মিত প্রশ্ন ভেঙে পড়ে তার কণ্ঠে, কি হল প্রিয়তম?

—আমাকে ক্ষমা কর দিলবানু, আমাকে মুক্তি দাও।

—হঠাৎ এ কথা কেন?

—আমি সর্বনাশের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমিই আমাকে

রক্ষা করেছ।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

উত্তর দিতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের অধরে ক্লিষ্ট হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে চলে, তোমার দাসী রুক্মিণীর নাম যখন উচ্চারণ করলে আমার পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এল। ধাত্রীগড়ে আমার জায়গীর। সেখানে রুক্মিণী-নাম্নী এক নারী আমার প্রেমিকা। আমরা বাগদত্ত।

ক্ষণিক নীরবতার পর ইন্দ্রনাথ আবার বলে, রুক্মিণী ফুলের মত অপাপবিদ্ধা আমি আজ নিজেকে ভোগ-সম্ভোগে কলুষিত করলে তার কাছে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব। আমি যে নীতিভ্রষ্ট হব।

তুমি আমাকে মার্জনা কর দিলবানু।

ইন্দ্রের কথা শুনতে শুনতে এক অভাবিতপূর্ব অনুভূতির উদ্ভাস দিলবানুর হৃদয়কে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলে। যত দেখছে এই যুবককে ততই মুগ্ধ হচ্ছে এই তো যথার্থ প্রেমিক। নিজের জীবনে এই পুরুষের প্রেম পেল না তার বেদনা যেমন একদিকে তার হৃদয়কে মথিত করে, তেমনি যে নারী এর প্রেমলাভে ধন্য হয়েছে তার জন্যও দিলবানুর হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে নারী সে নিজে নয়, কিন্তু সেও তো কোন নারী। আর তার জন্য নিজের হৃদয়ের দাবীকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করবে না দিলবানু।

ক্ষণকাল পরে দিলবানু যখন কথা বলে তখন তার কণ্ঠে উত্তেজনার আভাসমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না ধীর অকম্পিত স্বরে সে বলে, তুমি ফিরে যাও, তোমার রুক্মিণীর বুকে। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। শুধু একটিমাত্র অনুরোধ তোমার কাছে। আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা কোরো এই ভেবে যে দিলবানুর প্রেমহীন অন্তরে যে প্রেমের উদ্ভাসন তুমি ঘটিয়েছিলে একমাত্র তারই দামে সে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পেতে চেয়েছিল। তোমার সামনে এই যে নারী সে

স্বভাবতই প্রেম-চতুরা। কিন্তু তোমাকে সে যে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল তার মধ্যে কোন মালিন্য ছিল না।

কথাগুলো বলতে বলতে শেষদিকে দিলবানুর কণ্ঠে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

—এখন তাহলে আমাকে বিদায় দাও দিলবানু।

—একটু অপেক্ষা কর।

দিলবানু কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে ইন্দ্রনাথের সম্মুখে নতজানু হয়। করযোড়ে বলে, মনের একটি কোণে এই হতভাগিনীর জন্য একটু স্থান রেখ, এই একমাত্র প্রার্থনা।

ইন্দ্রনাথ দু'হাত ধরে তাকে সম্মুখে দাঁড় করায়। বলে, মনের একটি কোণ নয়, মনের আধখানা জুড়েই তুমি চিরকাল বিরাজ করবে দিলবানু।

—আমি সর্বান্তঃকরণেই একথা বিশ্বাস করলাম, কারণ এটুকু বুঝেছি মিথ্যাভাষণ তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। আর এখানেই আমার জয়। এই স্বাদটুকু নিয়েই বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।

—বিদায় দিলবানু।

— বিদায় প্রিয়তম।

শেষবারের মত ইন্দ্রনাথের দৃষ্টি দিলবানুর মুখের উপর পতিত হয়। তার চোখে অশ্রু, কান্নার নিরুদ্ধ আবেগে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পরিশিষ্ট

দিলবানুর প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ইন্দ্রনাথ যখন প্রশস্ত রাজপথে পদার্পণ করে তখন রাত গভীর, চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আকাশে একফালি বাঁকা চাঁদ, তার ম্রিয়মান আলোকে পথের আবছা একটা হদিশ পাওয়া যায় মাত্র।

স্বাভাবিক কারণেই ইন্দ্রনাথের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। এবার কোন্ পথে সে অগ্রসর হবে?

কিন্তু দু'পা অগ্রসর হতে না হতেই প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী ছায়াচ্ছন্ন স্থান থেকে দু'জন সৈনিক অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করে। ইন্দ্রনাথের সারা শরীর বিপদাশঙ্কায় কঠিন হয়ে ওঠে। সে প্রশ্ন করে, তোমরা কে?

আভূমি কুর্নিশ জানিয়ে সৈনিকেরা উত্তর দেয়, আমরা সৈনিক, মহামান্য ভকিল-ই-ডরের নির্দ্দেশে আপনার প্রহরায় নিযুক্ত আছি।

—আমি ভকিল-ই-ডরের সাক্ষাৎ প্রার্থী। কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাব?

—তিনি তাঁর প্রাসাদেই অবস্থান করছেন। আমাদের উপর হুকুম আছে আপনার অভিরুচি অনুসারে যে কোন স্থানে যেন আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

—আমার জন্য অশ্বের বন্দোবস্ত করতে পার?

—অশ্ব প্রস্তুত আছে।

—তবে এখানেই অশ্ব আন।

একজন সৈনিক তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরাল থেকে বল্গা ধারণ করে একটি তেজী অশ্ব ইন্দ্রনাথের সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত হয়। ইন্দ্র সৈনিকের হাত থেকে রশ্মি ধারণ করে বলে, ভকিল-ই-ডরের প্রাসাদের পথ দেখাও।

ইন্দ্রের নির্দ্দেশানুসারে একজন সৈনিক তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহন করে আগুয়ান হয়, ইন্দ্রনাথ সেই সৈনিককে অনুসরণ করে। সে অনুমান করে পশ্চাদ্‌বর্তী সৈনিক তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাকে অনুসরণ করে আসছে।

রাজপথের উপর দিয়ে দ্রুতধাবমান তিনটি অশ্বের ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে অগ্রবর্তী হতে থাকে। পথ-পার্শ্ববর্তী বাতায়ন থেকে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ক্বচিৎ দু'একজন গৃহস্থ পথের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করে, কিন্তু তারা ভালোভাবে কিছু হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই আরোহীসমেত অশ্বত্রয় দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করে যায়।

অনুমান অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসে এক বিশাল প্রাসাদের সম্মুখে পথ-প্রদর্শক প্রথম অশ্বারোহী যাত্রাভঙ্গ করে। ইন্দ্রনাথ অনুমান করে এই বিশাল প্রাসাদের অধিকারী হলেন ভকিল-ই-ডর। অশ্ব থেকে অবতরণ করে প্রথম সৈনিক প্রাসাদের প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর ফটক পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে প্রাসাদের প্রহরারত রক্ষীদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা ও ইঙ্গিত-বিনিময় করে। স্বল্পকাল পরেই তোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

প্রথম সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক এবং ইন্দ্রনাথ অতঃপর অশ্বে আরোহন করেই প্রাসাদ-সংলগ্ন বিশাল চত্বরে প্রবেশ করে। মূল প্রাসাদে পৌঁছতে আরো কিছু সময় অতিবাহিত হয়।

ভূমিতল থেকে অন্ততঃ দশধাপ সোপাণ অতিক্রম করলে মূল প্রাসাদের মেঝে, সুতরাং সকলেই অশ্ব থেকে অবতরণ করে। প্রথম সৈনিক অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়, মালিক, আমার সঙ্গে আসুন।

—চল।

দ্বিতীয় সৈনিকটি সেখানেই অপেক্ষা করে; প্রথম সৈনিক অগ্রবর্তী হয়। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করে।

নানা ঘুর পথ সে যেভাবে অবলীলায় অতিক্রম করে তাতে ইন্দ্রনাথের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, এই বিশাল প্রাসাদের নাড়ী-নক্ষত্র এর পরিচিত। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার প্রহরারত কোন দ্বারীই তাদের বাধা দেয় না, বরং নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

অবশেষে একটি বিশাল কক্ষের সম্মুখবর্তী হয়ে প্রথম সৈনিকটির গতিভঙ্গ হয়। সে কর্তব্যরত দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে অনুচ্চস্বরে দু'একটি বাক্য-বিনিময় করে। অতঃপর ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলে, দয়া করে ভিতরে আসুন। মহামান্য মন্ত্রীপ্রবর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। ইন্দ্রনাথ কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে।

কক্ষান্তর্বর্তী আসবাব পত্রাদি এবং চিত্রসম্ভার এতই দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য যে এমনকি ইন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত না হয়ে পারে না। তার দৃষ্টি কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমণ করে। ইত্যবসরে ভকিল-ই-ডর অন্য এক দ্বারপথে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলেন, মানাবর, দয়া করে আসন গ্রহণ করুন।

ইন্দ্রনাথ একাধিক বহুমূল্য আসনের মধ্যে একটিতে উপবেশন করলে

ভকিল-ই-ডরও উপবেশন করেন। অতঃপর বলেন, আপনার কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটিয়ে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী।

ইন্দ্রনাথ কৌশলে দিলবাহুর প্রসঙ্গ পরিহার করে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। বলে, আগামী কালই আমি ধাত্রীগড়ের দিকে রওনা দিতে চাই। তার পূর্বে একবার সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা করি।

—বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি?

ইন্দ্রনাথ পূর্ণদৃষ্টিতে ভকিল-ই-ডরের দিকে তাকায়। দেখে তাঁর চোখে ঈষৎ ভীতির ছায়া পড়েছে। এর কারণ বুঝতেও তার অসুবিধা হয় না। কোনভাবে সুলতানের সামনে দিলবাহুর প্রসঙ্গ না উঠে পড়ে—এ বিষয়ে আগে থেকেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে চান। ইন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দেবার কণ্ঠে বলে, না বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। যাবার আগে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানানোই আমার অভিলাষ।

ইন্দ্রের কথা শুনে দুশ্চিন্তার ছায়া অপসৃত হয় ভকিল-ই ডরের মন থেকে, তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, আমি বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রাখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—এখন আমার সামান্য বিশ্রামের প্রয়োজন। তৎপূর্বে কিছু আহার্য্য, ইন্দ্র হাসিমুখে বলে ওঠে।

তার কথা শোনামাত্র বিশেষ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভকিল-ই-ডর। তিনি মৃদু করতালি বাজান. সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত সৈনিকটি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভকিল-ই-ডর তাকে নির্দ্দেশ দেন, অতিথির আহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তুমি নিজে সবকিছুর তত্ত্বাবধান করবে। অর্ধদণ্ড পরে তৃপ্তিকর ভোজ্য-পানীয় উদরস্থ করে ইন্দ্রনাথ যখন দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করে তখন তার মন আপাত-নিরুদ্বিগ্ন. স্বল্পকালের মধ্যেই সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়।

ভকিল-ই-ডর তাঁর কথা যথাযথভাবেই রক্ষা করেন। তাঁরই ব্যবস্থাপণায় বিদায় লগ্নে সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ইন্দ্রনাথের।

সুলতানের পক্ষ থেকে বহুমূল্য উপহার সামগ্রী অর্পিত হয়। ইন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেগুলি গ্রহণ করে।

বিদায়ের প্রাক্কালে সুলতান দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেন ইন্দ্রনাথকে। গভীর সৌহার্দপূর্ণ স্বরে বলেন, পূর্বেই বলেছি আমি যথার্থই মিত্রহীন। আমার চতুর্দ্দিকে যারা ভীড় করে আছে তারা আমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষা নয়, চাটুকার। সুপরামর্শ বা সাহায্যের প্রত্যাশায় ধাত্রীগড়ে সুলতানের পক্ষ থেকে দূত প্রেরিত হলে সে যেন প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে না আসে—বিদায় বেলায় এই প্রতিশ্রুতি—টুকুই কামনা করি।

ইন্দ্রনাথের মন থেকে সুলতানের প্রতি বীতরাগ ইতোপূর্বেই দূর হয়েছিল। এখন মানুষটিকে দেখে যেন উত্তরোত্তর বিস্ময় বোধ হয়। তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাই ইন্দ্রনাথের কণ্ঠেও আবেগের স্পর্শ লাগে। সে বলে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব। গভীর অশ্রদ্ধা এবং বীতরাগ নিয়েই এখানে এসেছিলাম, এখন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি শ্রদ্ধা এবং অনুরক্তি।

—বিদায় বন্ধু! খোদা হাফিজ!

—বিদায় সুলতান! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

*　　*　　*　　*

আবার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমণ।

কিন্তু এবার মন ভারমুক্ত। উপরন্তু দীর্ঘদিন পরে ঘরে ফেরার

উত্তেজনা। পরিস্থিতির কি চমকপ্রদ পরিবর্তন। সে কথা চিন্তা করতে করতেই ইন্দ্রনাথ পথ অতিক্রম করে।

দোয়াবের অজস্র রায়ত-প্রজাদের জন্য যে সংগ্রাম সে সংগঠিত করেছিল তাতে সে জয়ী হয়েছে।

শুধু যে কর মকুব হয়েছে তাই নয়। অত্যাচারের নগ্ন বীভৎসতাও বন্ধ হয়েছে।

তদুপরি আছে সুলতানের পক্ষ থেকে উদার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। দোয়াবের প্রজারা অন্ততঃ আর উপবাসে মরবে না। একটা বিরাট দুর্বিপাকের পর সব মিলিয়ে এর চেয়ে স্বস্তিকর অবস্থা আর কি প্রত্যাশা করা যায়।

এবার মাথা উঁচু রেখেই সে তার জায়গীরে ফিরতে পারে। তার পক্ষে গৌরবময় প্রত্যাবর্তন।

ইন্দ্রনাথের ভাবনার সূত্র এখান থেকেই অকস্মাৎ ব্যক্তিগত চিন্তার আবর্তে প্রবাহিত হতে থাকে। দু'চোখে আকুলিত প্রত্যাশা নিয়ে যে অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। তার দুই আয়ত চক্ষু ইন্দ্রনাথকে বিমনা করে তোলে। মনে পড়ে বিদায় লগ্নটির কথা। সে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করে নি। মুখে হাসি নিয়েই বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে বিলম্ব হয় নি বুকের অথই গভীরে জমা হয়ে ছিল নিরুদ্ধ কান্না।

ঐ দুই চোখেই তো ইন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছে জীবনের আশ্রয়

তার বিবাগী উদাসীন হৃদয়কে ঐ ক্ষুদ্রকায়া নারীই তো বেঁধেছে বন্ধনডোরে। আজ ঘরে ফেরার জন্য তার হৃদয়ে যে উদগ্র কামনা তার মূলে তো রুক্মিণী-নাম্নী সেই নারী।

যতই চিন্তা করে ততই যেন রুক্মিণীকে আরো বেশী অনন্যা বলে মনে হয় ইন্দ্রনাথের। তার অন্তরের গভীরের দুর্বার আবেগকে

সে পারে নি প্রেম বলে চিহ্নিত করতে, অথচ রুক্মিণী তাঁকে অভ্রান্ত-ভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছে। নারী কি অন্তর্যামী?

ইন্দ্রনাথের অধর প্রান্তে হাসি ফুটে উঠে। রুক্মিণী-নাম্নী এক নারীর হৃদয়পদ্মের দু-একটি দলকে সে বিকশিত হতে দেখেছে মাত্র। এবার তার চোখের সামনে একটি একটি করে পাঁপড়ি বিকশিত করে সে পূর্ণ-প্রকাশিত হবে। সে হয়ে উঠবে আরও মোহময়ী, আরও রহস্যময়ী, আরও প্রেমময়ী—একাধারে মাতা, কন্যা, জায়া, সখী—পরিপূর্ণ নারীত্বে বিকাশলাভ করবে সে।

ক্লান্ত অশ্বকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বার বার গতিভঙ্গ করতে হয়। রাত্রিবাসের জন্য বিরতি যাত্রাপথকে যেন দীর্ঘায়িত করে।

তবুও অনিবার্যভাবেই সব পথের শেষ আছেই। ইন্দ্রের যাত্রাও একসময় সমাপ্তির মুখে এসে পৌঁছয়।

পূর্ব আকাশ নবারুণ রাগে রঞ্জিত করে অভ্যুদয় ঘটছে জবাকুসুম—সঙ্কাশ সূর্যদেবের। ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ইন্দ্রনাথ স্পর্শ করে তার জায়গীর ধাত্রীগড়ের প্রান্তসীমা।

কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ থেকে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করে তার বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণাবোধ সংক্রামিত হয়। চতুর্দ্দিকে হতশ্রী রিক্ততার ছবি; কিন্তু তদুপরি দেখে নতুনতর উৎপাতের নানা চিহ্ন সর্বত্র সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত।

ইন্দ্রনাথ মুহূর্তের মধ্যে অনুমান করে নিতে পারে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের আশ্বাসপুষ্ট করসংগ্রাহকদের লোলুপ দৃষ্টি তার প্রাণপ্রিয় ধাত্রীগড়কেও মুক্তি দেয় নি। তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে নারকীয় অত্যাচারের রূপ। নির্বিচারে তারা গৃহগুলিতে অগ্নিসংযোগ করেছে, আরো কত উৎপীড়ন করেছে তারও হয়তো ইয়ত্তা নেই। তার অনুপস্থিতিতে প্রকৃতই কতখানি ক্ষতি তারা করেছে, কত প্রাণ

সংহার করেছে তার নির্ভুল হিসাব এখন অনুমান করা কঠিন, কিন্তু যে নগ্ন দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে রেখে গেছে তাও কম বীভৎস নয়। ইন্দ্রনাথ শুধু অপলকে চেয়ে থাকে আর তার হৃদয়ের গভীরে হাহাকার-ধ্বনি বেজে ওঠে।

ইতোমধ্যে বাতাসের মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনভাবেই তার আগমন সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ ছুটে আসে তাদের প্রিয় নায়কের চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ায়। ইন্দ্রনাথ লক্ষ্য করে তাদের সকলের মুখেই কিসের উৎকণ্ঠার ছায়া। সবাই বিভ্রান্ত, নৈরাশ্যপীড়িত।

ইন্দ্রনাথ তাদের উদ্দীপিত করতে চায়। চিৎকার করে সকলের উদ্দেশ্যে বলে সুলতানী ফরমান শোন নি তোমরা? সমস্ত প্রাপ্য কর মকুব, এমনকি পুরাণো কর পর্যন্ত। তাছাড়াও সুলতান আশ্বাস দিয়েছেন, এযাবৎ যত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে রাজকোষ থেকে। আমরা আমাদের সংগ্রামের মূল্য পেয়েছি।

—আমরা সবই শুনেছি।

সমবেতভাবেই জনতা তার কথার উত্তর দেয়। তবু তাদের কণ্ঠে আনন্দের স্পর্শ নেই। অনুত্তেজিত তাদের কণ্ঠস্বর।

—তবে সকলে এত ম্রিয়মান কেন? ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছেই, তার জন্য আমাদের মন তো তৈরিই ছিল। আমরা তো শপথ করেছিলাম, সকলে মিলে সব বিপদ ভাগ করে নেব। এখন শোক করার সময় নয়, নতুন করে আবার গড়ার সময়।

ইন্দ্রনাথের উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরও সম্মিলিত জনতার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন অনুচ্চ কণ্ঠে বলাবলি করে। ইন্দ্রনাথ অনুমান করে তারা কিছু বলতে চায়, অথচ দ্বিধায় বলতে পারছে না।

একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে ইশারায় নিকটবর্তী হতে বলে ইন্দ্রনাথ।

সে কাছাকাছি এলে তাকে উদ্দেশ্য করে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করে কোন বিশেষ দুঃসংবাদ আছে?

উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর শুকিয়ে আসে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে শুধু বলে, হ্যাঁ।

—কি দুঃসংবাদ?

—কর সংগ্রাহকেরা ধাত্রীগড় আক্রমণ করেছিল।

—তার চিহ্ন তো চতুর্দ্দিকেই ছড়ানো দেখছি। কেউ হতাহত হয়েছে?

—আপনার নির্দেশমত আমরা সম্মুখ যুদ্ধ করিনি। বেশীর ভাগ গ্রামবাসী বনাঞ্চলে পলায়ন করেছিল। নারী এবং শিশুরা আপনার প্রসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

—তারপর?

—করসংগ্রাহকেরা সৈনিকদের সহযোগিতায় সারাদিন গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। দিনান্তে তারা আপনার প্রসাদ আক্রমণ করে।

—তারপর?

—রাত্রির প্রথম প্রহরে তারা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভীম সর্দ্দারের জন্য কিছু করে উঠতে পারে নি। ভীম মত্ত হস্তীর মত লড়াই করেছে, তাকে দেখে আপনার প্রাসাদ রক্ষীরাও মরণপণ যুদ্ধ করতে থাকে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে গ্রামের সমর্থ যুবকরা অস্ত্রশস্ত্রসহ বনাঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করে এবং পশ্চাদ্দেশ থেকে সুলতানী সৈন্যদের ভীষণভাবে আক্রমণ করে। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বহু সুলতানী সৈন্য হতাহত হয়। তারা শেষপর্যন্ত পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

—আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা কত?

কেউ হত হয় নি, আহতের সংখ্যা পঞ্চাশাধিক।

—এদের মধ্যে কারো জীবনাশঙ্কা আছে ?

—মাত্র একজনের।

—কে সে ?

—ভীমসর্দার।

উত্তর শুনে ইন্দ্রের সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসে। পিতৃহীন সে, তার একমাত্র অভিভাবক ভীমসর্দার; তাকে তো এভাবে বিদায় দিতে পারে না সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে কি যেন বলে ইন্দ্রনাথ, তার পর উন্মাদ বেগে প্রাসাদের দিকে অগ্রধাবন করে।

ভীমের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্রনাথ বাষ্পাকুল স্বরে ডেকে ওঠে, সর্দার ?

ভীমসর্দার মুদিত চক্ষু খুলে বলে, এসেছ দাদো ?

—এসেছি, কিন্তু এ কি অবস্থা তোমার ?

—দুঃখ কোরো না দাদো, এর চেয়ে সুখের মৃত্যু আর কি হতে পারে ? তোমার পিতার কাছে দায়বদ্ধ ছিলাম, আজ তুমি বড় হয়েছ, আমি দায়মুক্ত।

কথা বলতে বলতে ভীমের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। তবু সে বলে, সবচেয়ে সুখের কথা কি জানো ? আমায় রুক্মি মায়ের সেবা। দিন নেই, রাত নেই, সে অতন্দ্র আমার মাথার শিয়র বসে আছে। এত সেবা পেয়ে মরছি—আর কি চাইবার থাকতে পারে ?

ইন্দ্রের দু'চোখের দৃষ্টি রুক্মিণীর মুখের উপর গিয়ে পড়ে। মনে হয় সে যেন এক বিষাদপ্রতিমা।

দিনান্তে একহাতে রুক্মিণীর হাত, অন্যহাতে ইন্দ্রনাথের হাত দৃঢ়ভাবে বুকের উপর ধারণ করে ভীমসর্দার চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মুখমণ্ডলে লেগে থাকে এক অব্যাখ্যাত হাসির ছোঁয়া।

ইন্দ্রনাথ ও রুক্মিণী দুঃসহ বিয়োগব্যথায় বজ্রাহতের মত বসে; থাকে ভীমসর্দারের জীবননাট্যের শেষতম অধ্যায়ের দুই মৌন সাক্ষী।